॥ প্রকাশক ॥

কে. বসু

১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ: মার্চ, ১৯৬০

শিল্পী : সূর্য রায়

॥ মুদ্রাকর ॥

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত পাণ্ডা

আদি-মুদ্রনী

৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

বহ্নি-কন্যা

প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্মের

অবিস্মরণীয় স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

ভূমিকা

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশিষ্ট একটা স্থান সংগ্রামী বিপ্লবীদের—বিশেষ করে, বাঙালি বিপ্লবীদের। দু-এক দশকে তা সীমাবদ্ধ ছিল না; দু-এক স্থানে বা প্রদেশেও না, আবার দু-এক দলের মধ্যেও না। প্রায় অনিবার্য কারণেই দলগুলি ছিল 'গুপ্ত সমিতি' এবং নানা গোষ্ঠীতে সংগঠিত। উদ্যোগে-আয়োজনে একের কাজ অপরে জানবার কথা নয়; এমন-কি স্বদলের মধ্যেও যারা যে উদ্দেশ্যে নিযুক্ত তারা ছাড়া সে কাজের কথা দলের অন্যেরও জানা নিয়ম নয়—গুপ্ত সমিতির কাজের এরূপই ধারা। অবশ্য সমিতিগুলির নেতাদের মধ্যে আলোচনা পরামর্শ যে হ'ত না তা নয়। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে হলে এইসব বিভিন্ন গুপ্তসমিতির কাজের হিসাবও নিতে হয়। সাধারণভাবে সরকারী বেসরকারী প্রামাণিক কাগজপত্র অনুসন্ধান ও বিচার করে এরূপ বই লিখিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন দল বা 'গ্রুপের' কথাও কিছু-কিছু লিখিত হয়েছে। কিন্তু সকল গ্রুপের তথ্য পরিবেশিত না হলে এই সংগ্রামী বিপ্লববাদের ইতিহাস-সম্মত উপাদান সম্পূর্ণ পাওয়া যাবে না। যথার্থরূপে সে কাজ সম্পন্ন করা তাই প্রতি দলের যোগ্যলোকদের এখন একটা পালনীয় দায়িত্ব। একদিন যা গোপন করাই ছিল নিয়ম আজ তা অকপটে প্রকাশ করাও কর্তব্য।

বন্ধুবর শ্রীঅখিল চন্দ্র নন্দীর 'স্মৃতিচারণা'য় বিপ্লবীদের বহুবিস্তৃত কর্মধারার একটি চমকপ্রদ ও দুঃসাহসিক অংশ অলোচিত হ'ল। এ অংশটি বাঙালি বিপ্লবীদের ইতিহাসের একটি গুরুতর অধ্যায়, একটি ল্যাণ্ডমার্ক। সমস্ত বিষয়টি যেরূপ গভীর তথ্যনিষ্ঠা ও অকপট সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে এ বইতে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তাও বিশেষ লক্ষণীয়। অখিলবাবু নিজেকে 'লেখক' নন বলে বলেছেন; তাঁর এই 'স্মৃতিচারণ কিন্তু ওকথাটা অপ্রমাণিত করবে। এরূপ স্মৃতিচারণার ত্রুটিগুলি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তিনি কাটিয়ে নিয়েছেন। সমস্ত লেখাটির মধ্যে—কি সমিতির কর্মকাণ্ড ও ঘটনার বর্ণনায় কি নিজের পরিবার পারিপার্শ্বিকের কথায়-এমন একটি সহজ বাহুল্যহীন অকৃত্রিমতার ছাপ আগাগোড়া পাওয়া যায়, যা তথাকথিত লেখকরা হারিয়ে ফেলেন, অথচ যা সাহিত্যেরই সদ্গুণ। বিষয়গুরুত্বে

তো নিশ্চয়ই, বিষয় পরিবেশনেও তাই তার স্মৃতিচারণা কৌতূহলোদ্দীপক ও আদরণীয়, আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস।

এ জাতীয় বই-এর ভূমিকা লেখার যোগ্য মানুষ আমি নই, বিপ্লব-পথের প্রণম্য অগ্রণীরাই তার অধিকারী। এই আন্তরিক কুণ্ঠা পরিহার করেও আমি তাঁর অনুরোধ রক্ষা করছি এ জন্যই—লেখাটি আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে। আশাকরি—ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুরাও একে সার্থক বিবেচনা করবেন।

ইতি

গোপাল হালদার

মুখবন্ধ

আমার কনিষ্ঠ পুত্রবধূ শ্রীমতী জয়শ্রী আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল ইংরেজ আমলে কি এমন কাজ করেছিলাম যার জন্য আমাকে সাত বছর জেলে থাকতে হয়েছিল?

আমাদের দেশের গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে বহু ঘটনা একালের তরুণ তরুণীদের অজানা। যা লিখিত হয়েছে তার চেয়ে বেশী রয়েছে অলিখিত। ইংরাজ রাজত্বে অনেক কিছু লেখা সম্ভব ছিল না। স্বাধীনতার পরেও অনেক কথা লিখতে সে যুগের বিপ্লবীরা দ্বিধা-সঙ্কোচ বোধ করেছেন পাছে অন্যেরা তা আত্মপ্রচারের মোহ বলে মনে করে। যদিও প্রকৃত বিপ্লবীরা এই মোহ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

যাহোক, পুত্রবধূর প্রশ্ন শুনে আমার মনে হয়েছে ত্রিশদশকের রক্তঝরা দিনগুলির কথা, ত্রিপুরা জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের কিছু কথা একালের মানুষদের জন্য লেখা দরকার।

এ প্রসঙ্গে মনে হল আমার জন্মস্থান কালীকচ্ছ, আমার বংশ পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কেও আমার উত্তরপুরুষদের জন্য কিছু লিখে রাখা দরকার। তারা দেশ বিভাগের ফলে পিতৃভূমির ইতিহাস জানবার সুযোগ হারিয়েছে।

আমার বয়স হয়ে গেছে তাই অনেক কথাই ভুলতে বসেছি। যা এখনও মনে রয়েছে তা প্রকাশ করে রেখে যেতে চাই। ভবিষ্যতে কোন গবেষক বা ব্যক্তি যদি এর থেকে কিছু মাল-মশলা পান তাহলেই আমার লেখা সার্থক।

আমি লেখক নই। এককালে হাতে রিভলভার ধরেছি। কোন কালে কলম ধরতে হবে ভাবিনি। তাই লেখার মধ্যে ভুল ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তবে একটি ভুলের জন্য সর্বান্তঃকরণে আগেই মার্জনা চেয়ে রাখছি। স্মরণশক্তির ক্ষীণতার জন্য বন্ধুদের অনেকের নাম ভুলে গেছি। যদি কোন ঘটনার সঙ্গে জড়িত কারও নাম বাদ পড়ে থাকে সেটা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি।

আমার স্মৃতিচারণের ভূমিকা লিখে দিয়ে বিখ্যাত বিপ্লবী সাহিত্যিক শ্রীগোপাল হালদার আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

গ্রন্থটির মুদ্রণ সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিষয়ে আমায় সাহায্য করেছেন সাহিত্যিক শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ ও আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ শ্রীমতী পাপিয়া, তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

৪০৪ বি, যোধপুর পার্ক
কলিকাতা—৬৮

অখিল চন্দ্র নন্দী

শহীদ অসিতরঞ্জন ভট্টাচার্য

জন্ম—৪ এপ্রিল ১৯১৫ ফাঁসি—২ জুলাই ১৯৩৪
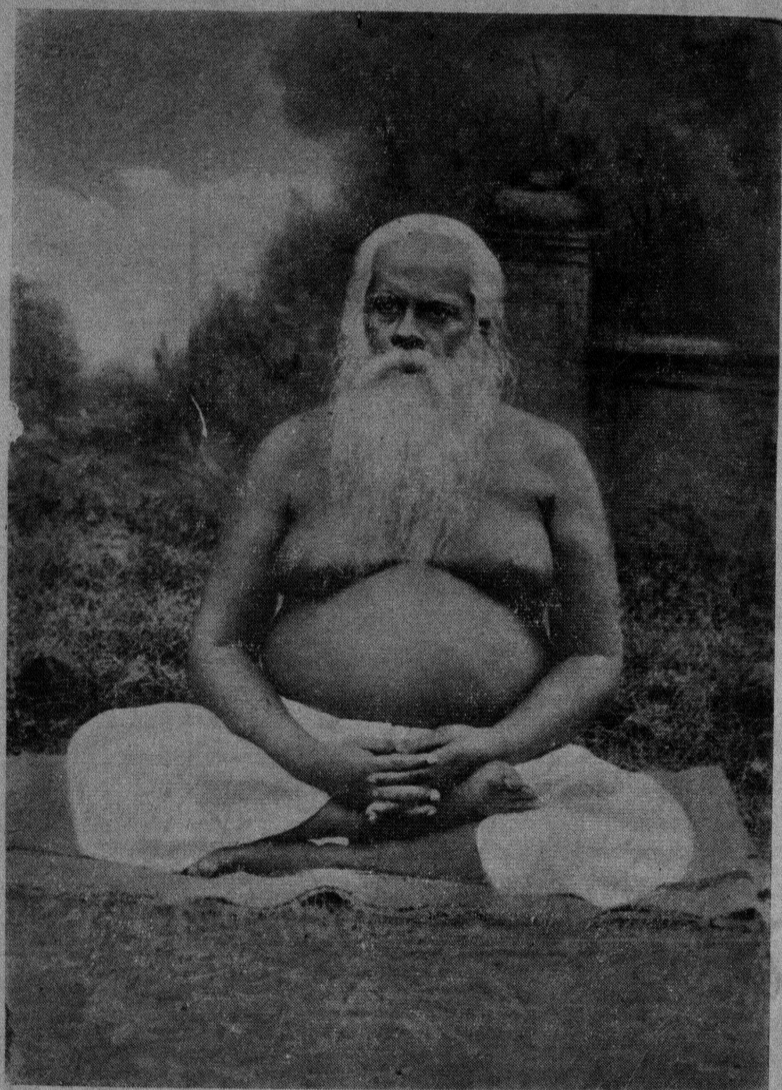
ডাঃ মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

জন্ম—৮ অগ্রহায়ণ ১২৬১ মৃত্যু—২৫ আষাঢ় ১৩৩৯

অশোক নন্দী

জন্ম—১৮৮৮ সাল

মৃত্যু—৬ আগষ্ট ১৯০৯

প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম
ত্রিপুরা জিলা ছাত্রীসংঘের সভানেত্রী

জন্ম—২২ ফেব্রুয়ারী ১৯১৪ মৃত্যু—২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭

শান্তি ঘোষ
ত্রিপুরা জিলা ছাত্রীসংঘের সম্পাদিকা

সুনীতি চৌধুরী
মেজর, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী
ত্রিপুরা জেলা ছাত্রীসংঘ
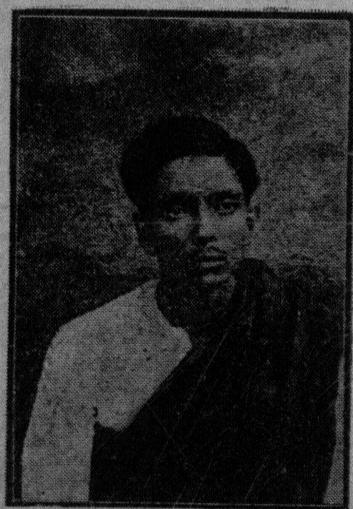
অখিলচন্দ্র নন্দী
ত্রিপুরা জিলা ছাত্রসংঘের সভাপতি

—এক—

॥ আমার কথা ॥

ভারতের স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মানিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাম্রপত্র অর্পণ করে। যাঁরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, অনেক অত্যাচার সহ্য করেছিলেন, তাঁরা প্রায় বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে। অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর পিতা জহরলালের বিপ্লবীদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। বিপ্লবীনেতা যোগেশ চ্যাটার্জীর কাছে এ সম্বন্ধে অনেক ঘটনা শুনেছি। সরকারী সাহায্য নিতে অস্বীকার করেছিলেন উল্লাসকর দত্ত, তবু গোপনে তাঁকে সাহায্য করেছেন পণ্ডিত নেহেরু। ইন্দিরা গান্ধী তাম্রপত্র অর্পণের মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে উঁচু করে তুলে ধরলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের।

ভাবলে আনন্দ হয় যে, আমাদের পরিকল্পিত অ্যাকশন-এ অংশ গ্রহণকারীরা তাঁদের বীরত্বের ও অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি লাভ করেছেন। যে বালিকাদ্বয়ের আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জনে সারা ভারত একদিন চমকে উঠেছিল, ধূলায় লুটিয়ে পড়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি স্তম্ভ—কুমিল্লার জেলাশাসক মিঃ ষ্টীভেন্স, সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে অগ্নি-অক্ষরে লেখা অতুলনীয় দুটি নাম—শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী—উৎকীর্ণ হয়েছে তাম্রপত্রে। 'অবলা নারী', বিশেষ করে অত অল্পবয়সের বালিকাদ্বয়ের হাতে রিভলবার তুলে দিয়ে অ্যাকশন-এ প্রেরণ করার জন্য, তাদের মৃত্যু মুখে ঠেলে দেবার জন্য সেদিন কেউ কেউ আমাদের ধিক্কার দিয়েছিল, নিন্দা করেছিল। বেশীদিনের কথা নয়, ১৯২২ সালে চাকদা বিধান সভার নির্বাচন উপলক্ষে আমার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সভায় সমালোচনা হয়েছিল যে, আমি ভীরু, তাই নিজে

পেছনে থেকে ছোট মেয়ে দুটিকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ ইতিহাসের চাকা ঘুরে গেছে। এই স্বীকৃতি-দানের কালে আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে চট্টগ্রাম সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নায়ক শহীদ সূর্য সেনের কথা, যিনি তার গুপ্ত আবাস থেকে আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সর্বপ্রথম নারী-সৈনিক নিয়ে রক্তাক্ত সংগ্রাম শুরু করার জন্য। মনে পড়ছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কথা, যিনি ভারতের বাইরে সিঙ্গাপুরে নারী-বাহিনী গঠন করার সময় পথিকৃৎ নারী সৈনিকদ্বয় শান্তি-সুনীতির নামোল্লেখ করেছিলেন।

রজত-জয়ন্তী বর্ষে অনেক বিপ্লবী বন্ধু আকাশবাণী হতে বেতারে প্রচার করেছেন তাঁদের স্মৃতিকথা, অনুরুদ্ধ হয়ে আমিও বেতার মাধ্যমে শুনিয়েছি কিছু কথা। সংবাদপত্রের পাতায়ও কিছু কিছু উল্লেখ করেছি।

কিন্তু আরও কত কথাই না বলার আছে। সেই অগ্নিঝরা, রক্তঝরা দিনগুলোর কথা। সেইসব সহ-যোদ্ধাদের কথা—

"লক্ষ লক্ষ অক্ষমের অপমানে আপনার অপমান মানি
সুকঠোর দৃঢ়হস্তে যে খুঁজিল প্রতিদিন তার প্রতিকার।"

সর্বাগ্রে আজ মনে পড়ে সতীর্থ শহীদ অসিতরঞ্জন ভট্টাচার্যের কথা যে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিল ২রা জুলাই ১৯৩৪ সালে। মনে পড়ে আমাদের দলের মহিলা বিভাগের নেত্রী বিপ্লবী প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্মের কথা, আগ্নেয়াস্ত্র হাতে প্রাণ দিতে ও নিতে যাবার জন্য তার আকুল আগ্রহের কথা। মনে পড়ে মহাপুরুষ ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কথা, যাঁকে শ্রীঅরবিন্দ বলতেন "ভারতের ঋষি তলস্তয়"। মনে পড়ে আশ্চর্য মানুষ উল্লাসকরের কথা, রসিকতা, কোমলতা ও কঠোরতার অপূর্ব সংমিশ্রণ। মনে পড়ে রেবতী বর্মণের কথা, যাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য মুগ্ধ করেছিল বাংলার ছাত্র ও যুবকদের। মনে পড়ে আমাদের দলের নেতা ও স্রষ্টা ললিতমোহন বর্মণের কথা।

"অগ্নি আখরে আকাশে যাহারা
লিখিল আপন নাম,
চেন কি তাদেরে ভাই ?
জীবন মৃত্যু দুই তরঙ্গ
জুড়ে তাঁরা উদ্দাম
দুয়েরই বলগা নাই।"

এই সব দেশপ্রেমিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পেরেছিলাম বলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

"বিগত পথিকদলে করি নমস্কার।"

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি—"আকাশেতে আমি রাখিনিক মোর উড়িবার ইতিহাস, তবু উড়েছিনু এই মোর উল্লাস।"

কৈশোরে আমি যে পথে অগ্রসর হয়েছিলাম সে পথের প্রতিপদে ছিল 'গুপ্ত সর্প গূঢ় ফণা'। ছিল 'শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ' আর ছিল 'রুদ্রের প্রসাদ'। পথের প্রান্তে ছিল শহীদের মৃত্যু, ফাঁসি, দ্বীপান্তর, কারাবাস ও নির্যাতন।

এই দুর্গম পথ পেরিয়ে আজ এসে পৌঁছেছি 'মুক্তি মন্দির সোপান তলে'। যে স্বাধীনতার স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম তার সার্থক রূপায়ন আজও হয় নি। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে হবে, 'সেদিন সবহারাদের হস্তে তুলিবে সব পেয়েছির জয় কেতন'।

বর্তমানের বুকে বসে ভারতের ভবিষ্যৎ ও অতীত দুই-ই আমি দুচোখ ভরে দেখার চেষ্টা করছি। ভবিষ্যতের কথা ভাবি আর অতীতের স্মৃতিচারণ করি।

আমার সেই স্মৃতির কিছু ছবি কলম দিয়ে আঁকার চেষ্টা করছি। মনে মনে ফিরে যাবার চেষ্টা করি আমার যৌবনে, বাল্যে, জন্মকালে, জন্মস্থানে......

"এসেছে সে একদিন
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে..."

দূর অতীতে পাঞ্জাবের গণজাগরণ উপলক্ষে কবি এই কথাগুলো লিখেছিলেন। অদূর অতীতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলাদেশেও এমন ধারা দিন এসেছিল। সেদিনের গণজাগরণের জোয়ারে 'বাংলাদেশ ডুবু ডুবু, ভারত ভেসে যায়'। স্বাদেশিকতার প্রবল বন্যাকালে পূর্ববাংলার এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে আমার জন্ম, ১৯০৮ সালের ৭ই মার্চ।

ত্রিপুরা জেলার (বর্তমানে কুমিল্লা) কালীকচ্ছ গ্রামের হোমিওপ্যাথ ডাক্তার প্রকাশচন্দ্র নন্দী আমার পিতা, মাতা চন্দ্রকুমারী নন্দী। গ্রামের স্বচ্ছল পরিবারে পুত্র সন্তানের জন্ম খুব সম্ভব শঙ্খধ্বনি দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল। আমার জন্মলগ্নে জানি না গ্রহলগ্নের কি অবস্থান ছিল, কিন্তু আমি যখন সূতিকাগারের বাইরে মাস দেড়েকের শিশুমাত্র, তখন ভারতের ভাগ্যে এসেছিল এক পুণ্যলগ্ন, মোহনিদ্রা হতে জাগরণের শুভক্ষণ। পরাধীন ভারতবাসীর ঘুম ভাঙ্গল ক্ষুদিরামের বোমা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে, কেঁপে উঠল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বনেদ। শুভ শঙ্খধ্বনি, গ্রহ-নক্ষত্রের সমাবেশ, রাশিচক্রের বিচার-বিশ্লেষণের চেয়ে বোমা বিস্ফোরণ, রাজনৈতিক ভূমিকম্প, জনসমুদ্রের জোয়ার কি নবজাতকের ভাগ্য বেশী নিয়ন্ত্রিত করে? ভাগ্য-লিপিকার বৃদ্ধ বিধাতাই হয়তো তা বলতে পারেন।

॥ কালীকচ্ছ ॥

আজ দূর অতীতের দিকে দৃষ্টি মেলে স্মৃতিচারণ করতে বসে বিপ্লবী বন্ধুদের কথা বলতে গিয়ে সর্বপ্রথমে দেশের সাধারণ মানুষের ছবিও চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সেই সঙ্গে ভেসে উঠছে আমার জন্মভূমি—ছেড়ে আসা গ্রামটি। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই গ্রামটির অবদান কিছু কম নয়। অসংখ্য গ্রামপূর্ণ পূর্ব-বাংলায় কালীকচ্ছ একটি নাম—সে অন্যতমা, সে অনন্যা, সে আমার গ্রামজননী! পূর্ব-বাংলার আর সব গ্রামের মতই জল-বাতাস ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আমার কালীকচ্ছ মহিমময়ী। আর সবার মত আমারও মনে দেহে শিহরণ জাগে বহু স্মৃতিবিজড়িত সেই জন্ম-গ্রামের কথা ভাবতে। মায়ের মত করে সেই গ্রামই আমায় শিখিয়েছিল সংগ্রামময় এই পৃথিবীতে সংগ্রামী হয়ে বেঁচে থাকতে।

ত্রিপুরা জেলার (কুমিল্লা) উত্তর প্রান্তে আমাদের কালীকচ্ছ অবস্থিত। মহকুমা শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়া আট মাইল দূরে। আমাদের রেল-স্টেশন ঐ ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেই। গ্রামের পশ্চিম দিকে একটি বড় খাল, ওই খাল উত্তর দিকে মিশে গেছে একটি বিলে, হাওরে। গ্রামের পশ্চিমে ৪।৫ মাইল দূরে মেঘনা নদী। সেই নদীতে বার মাস জাহাজ চলে। আমাদের ষ্টীমার স্টেশন ছিল আজবপুর। ওই দূরবর্তী রেল বা জাহাজ চড়ে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী যাওয়ার চেয়ে বর্ষাকালে নৌকোতে যাওয়া আমরা বেশী পছন্দ করতাম। বর্ষায় খাল-বিল ফুলে ফেঁপে উঠত আর আমাদের মন আনন্দে ভরে উঠত। নৌকো নিয়ে মামার বাড়ী, দিদির বাড়ী যেতাম। নৌকোতে রান্না করে খাওয়া, নৌকার দোলানোতে ঘুমাতে কি আনন্দই না পেতাম। বর্ষাকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস নদীতে নৌকো প্রতিযোগিতা হত। রংবেরং-এর ছোট বড় অনেক নৌকো তাতে অংশ গ্রহণ করত। সারা

মহকুমার লোক জড় হত ওই প্রতিযোগিতা দেখার জন্য। সে ছিল এক বড় উৎসব। আমরা দলবদ্ধ হয়ে যেতাম তা দেখবার জন্য।

কালীকচ্ছ গ্রামটি লম্বায় প্রায় আড়াই মাইল এবং চওড়ায় এক মাইল। জন সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। মুসলমান ছাড়া অন্য সব জাতির লোকের বাস ছিল গ্রামে। গ্রামটির বিভিন্ন পাড়ায় তারা বাস করত। নন্দী পাড়া, দত্ত পাড়া, কুমোর পাড়া, কৈবর্ত্ত পাড়া, মালী পাড়া, কর্মকার পাড়া, বারুই পাড়া, নাপিত পাড়া, মুনিরবাগ ও ধামাইদ পাড়া। এক একটি পাড়াই ছিল ছোট এক একটি গ্রাম। গ্রামে ছিল মাইনর স্কুল (M.E. School), একটি ছেলেদের ও একটি মেয়েদের। ছেলেমেয়েদের প্রাইমারী স্কুল ছিল চারটি। এই প্রাইমারী স্কুলের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য রসিক নন্দীর পাঠশালা। এই পাঠশালায় যার হাতেখড়ি হয়েছে সে যে জীবনে কখনো অঙ্কে ফেল করবে না এ ধারণা ছিল স্বতঃসিদ্ধ। আর একটি বিষয় ছেলেরা ভালভাবে জানত যে পড়ায় ফাঁকি দিলে রসিক নন্দীর বেত পিঠের চামড়া কেটে বসে যাবে।

নিকটবর্ত্তী সরাইলে ছিল হাই স্কুল। সেখান থেকেই আমি মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করি। সরাইলের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করতে হয় বিখ্যাত সরাইলের শিকারী কুকুরের কথা। এ সম্বন্ধে নীরোদচন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন—"Sarail was also famous, most famous, for a breed of hounds intermediate in build between the Great Dane and Grey-hound. These dogs were greatly prized throughout northeastern Bengal". (Autobiography Of An Unknown Indian.)

গ্রামেই পোস্টাফিস ছিল। 'কালীকচ্ছ লোন কোং' নামে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানও ছিল। বাজার বসত রোজ সকাল ও বিকেলে। শিবমন্দির ছিল কয়েকটি, দুটো কালীবাড়ী ছিল—রক্ষাকালী ও শ্মশানকালী। গত বছর দেখে এলাম পাকিস্থানী আমলে শ্মশানকালী

অপহৃত হয়ে গেছে। দুর্গাপূজো হত প্রায় ১০।১২টি বাড়ীতে। পূজোর ছুটিতে বিদেশে বসবাসকারী আত্মীয়-স্বজন আসত। কলকাতা হতে যারা আসত তাদের কথাবার্তা, চলাফেরা আমাদের খুব আনন্দ দিত। পূজোর সময় সারা গ্রাম আনন্দে মেতে উঠত। গ্রামের এ সব পূজো-পার্বন সম্পন্ন করার জন্য দুজন পুরোহিত ছিলেন—সারদা চক্রবর্তী ও দ্বারিকা চক্রবর্তী। এঁরা এসেছিলেন সিলেট থেকে এই কাজের জন্য। এটাই ছিল তাঁদের পেশা।

আমাদের গ্রামের আর একটি বৈশিষ্ট্য—সেখানে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। ৩০/৪০ জন স্মৃতিকণ্ঠ, কাব্যতীর্থ, স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি উপাধি লাভ করেছিলেন। প্রায় দশটি টোল ছিল। বিভিন্ন জেলা থেকে সংস্কৃত অধ্যয়ণ করার জন্য ছেলেরা আসত এবং পণ্ডিতদের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করত। উদাত্ত কণ্ঠের সংস্কৃত পাঠের সুরে মুখরিত হয়ে থাকত কালীকচ্ছের প্রভাতী আর সান্ধ্য আকাশ।

সঙ্গীত চর্চাও ছিল গ্রামে। বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করেছিল যাত্রার দলটি। হাইস্কুলের কেরানী উপেন্দ্র চক্রবর্তীর উদ্যোগেই দলটি গঠিত হয়। তাঁরই বাড়ীতে যাত্রার দলের মহড়া বসত। এই যাত্রা দেখার জন্য ছোট বেলায় আমরা অস্থির হয়ে যেতাম। শীতকালেই যাত্রার অভিনয় হত। রাত ৮টা-৯টার সময় মধুর সুরে ক্ল্যারিওনেট বেজে উঠতেই আমরা পড়ি কি মরি করে ছুটে যেতাম যাত্রার আসরে। কে আগে সামনের আসন দখল করতে পারে তার জন্য চলত ঠাণ্ডা লড়াই, কখনও কখনও হাতাহাতিও শুরু হত। কখনও সাপ-সাপ বলে ভয় দেখিয়ে দিয়ে চালাক ছেলেরা আমাদের জায়গা দখল করে নিত। আমার বাবা রাত্রে যাত্রা দেখতে যাওয়াটা পছন্দ করতেন না, তবু অনেক কান্নাকাটি করলে মাঝে মাঝে যেতে দিতেন। রাজপোশাক পরে গোবিন্দ ভট্টাচার্য যখন আসরে নামতেন তখন তাকে সত্যিকার রাজাই মনে হত, যেমন তাঁর জাঁকজমক পোশাক তেমনি ছিল তাঁর রাজপুরুষের মত সুন্দর চেহারা। রাণীও কম

আকর্ষণীয় ছিল না। বিড়িটি খেতে খেতেই আসরের দিকে অগ্রসর হত আর পার্ট ভুলে গিয়ে যখন তন্ত্রধারের শরণাপন্ন হত তখন আমরা খুব মজা পেতাম। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল জহ্লাদ লাখু ঠাকুর। তিনি যখন সাড়ে ছ-ফুট লম্বা দশাশই চেহারা নিয়ে লাল চেলী পরে খাঁড়া হাতে নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াতেন, তখন ভয়ে আমাদের শিরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডাস্রোত বয়ে যেত। লোমগুলো হয়ে উঠত খাড়া। দিনের বেলায়ও তাকে দেখলে আমাদের ভয় করত। এই যাত্রার দলটির খ্যাতি ছিল প্রচুর, তাই নিমন্ত্রিত হয়ে বিভিন্ন জেলায় অভিনয় করতে যেত। সেজন্য পারিশ্রমিকও পেত। একবার ভৈরবে 'বিজয় বসন্ত' পালায় বিজয় ভুলেই গেল যে, সে অভিনয় করছে। পালা জমে গিয়েছিল খুব বেশী। বসন্তের বুকে সত্যি সত্যি সে ছুরি বসিয়ে দিল। অবশ্য টিনের ছোরা, তবু বসন্তকে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল।

কবিওয়ালা হরি আচার্য, অর্জুন সরকার, নকুল সরকার, ভগবান সরকার কবির লড়াইয়ে কখনও কোথাও হার মানত না। লোকসঙ্গীতও সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এ বিষয় নীরোদচন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন—"কালীকচ্ছে যত লোকসঙ্গীত শুনেছি তার অর্ধেকও শুনিনি কিশোরগঞ্জে বা বনগ্রামে। সেখানে সাধারণ ছেলেমেয়েরা বলতে না বলতেই গাইতে শুরু করে দেয়।"

আমাদের গ্রামে বেশ সুদক্ষ কয়েকজন কর্মকার ছিল। নবীন কর্মকার বিপ্লবীদলের প্রয়োজনে বন্দুক তৈরী করে দিতেও সক্ষম হয়েছিলেন। এঁর তৈরী বঁটি গৃহিনীদের অত্যন্ত লোভনীয় হাতিয়ার ছিল। কলকাতার গিন্নীরাও ওই বঁটির ফরমাশ দিত।

সব গ্রামের ছেলেদের মতই আমাদের গ্রামের ছেলেরাও নানারকম খেলাধূলা করত। কিন্তু একটি খেলায় ছিল কালীকচ্ছের বৈশিষ্ট্য, এটা অনেকটা ক্রিকেট খেলার মত। কাঁচাবাঁশ শুকিয়ে বানানো হত দাঁড়া-ব্যাট, আর তেঁতুল গাছের সার দিয়ে তৈরি হত কাল

কুচকুচে গুটি ক্রিকেট বলের মত। দাঁড়া দিয়ে গুটি মারা হত ক্রিকেটের মত। এ খেলাটার নাম তাই গুটি-দাঁড়া খেলা। রজনী ডাক্তার বল এত জোরে মারতেন যে, ক্রিকেটের ওভার বাউণ্ডারীর চেয়েও বেশী আকর্ষণীয় হত।

শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজনীতি, সরকারী চাকরি, ব্যবসা সব ক্ষেত্রেই কালীকচ্ছের লোকেরা খ্যাতি লাভ করেছিল। কালীকচ্ছ সম্পর্কে নীরোদ চন্দ্র চৌধুরীর বই The Autobiography Of An Unknown Indian থেকে একটু উক্তি দিচ্ছি—

"It was wellknown as the home of gentlefolk noted for their birth, education, liberal ideas and worldly position. There were many persons from the village who held high posts in the service of the Govt., high that is to say, by the scale of highness applicable to Indians in those days. Among the village's other titles to the world's respect I might mention that two of the accused in the very first political bomb manufacturing and bomb throwing cases in India were sons of this village, so also was one of the first Indians to go to Sandhurst and hold tho King's Commission"
(P.91-92)

"বংশ মর্যাদা, শিক্ষাদীক্ষা, উদার মতবাদ, উচ্চ সামাজিক স্থান সম্পন্ন ভদ্রসম্প্রদায়ের বাসভূমিরূপে ইহা (কালীকচ্ছ) বিখ্যাত। গ্রামের বহুব্যক্তি সরকারী উচ্চ পদাধিকারী ছিলেন। সেকালে ভারতীয়দের প্রাপ্তি যোগ্য উচ্চতার মানদণ্ড অনুযায়ী এই উচ্চ কথাটি বলা চলে। পৃথিবীতে সম্মান পাবার মত গ্রামের আরও যে সব উপাধি ছিল, তার মধ্যে আমি এটাও উল্লেখ করতে চাই যে, ভারতে সর্বপ্রথম 'রাজনৈতিক বোমা তৈরী ও বোমা নিক্ষেপ' মামলার দুই আসামী এই গ্রামেরই ছেলে, সর্বপ্রথম ভারতীয় যিনি 'স্যাণ্ডহার্স্ট'

গিয়েছিলেন ও 'কিংস কমিশন' পেয়েছিলেন তিনিও এই গ্রামেরই ছেলে।"

উল্লাসকর দত্ত, অশোক নন্দী, মেজর জেনারেল সত্যব্রত সিংহ রায়ের কথা বলেছেন তিনি। আরও উল্লেখ করা যায়—জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর রমেশচন্দ্র দত্ত, পুলিশ ইন্‌স্পেকটার কালীনাথ নন্দী, সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ও বহু গ্রন্থের রচয়িতা দ্বিজদাস দত্ত, মহাপুরুষ আনন্দ নন্দী ও ডাঃ মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারিণী নন্দী, হেমেন্দ্র নন্দী, প্রকাশচন্দ্র সিংহ, রায়বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহ, ঐতিহাসিক কৈলাশচন্দ্র সিংহ, বর্ত্তমানে বিখ্যাত সাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্কব্যবসায়ী নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ও তাঁর পুত্র বটকৃষ্ণ দত্ত, কুমিল্লা লেবার হাউসের প্রতিষ্ঠাতা প্রমোদ ও প্রবোধ চক্রবর্তী, রায় সাহেব অনাথ দত্ত, ত্রিপুরার প্রথম মহিলা এম. এ. স্নিগ্ধপ্রভা সিংহ, প্রথম গ্রাজুয়েট মৃণালিনী নন্দী। শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতী অনেক শিক্ষক, অধ্যাপকও ছিলেন গ্রামে।

॥ বিপ্লবী আন্দোলনে কালীকচ্ছ ॥

কালীকচ্ছের যুবকরা বিপ্লবী আন্দোলনের গোড়া থেকেই তাতে অংশ গ্রহণ করেছে। ১৯০৮ সালে আলিপুর বোমার মামলায় ধৃত ও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন উল্লাসকর দত্ত, তার মামা অশোক নন্দী ঐ মামলায় বিচারাধীন থাকা কালে চিরমুক্তি লাভ করেন।

১৯১৬-১৯১৯ সালে কালীকচ্ছের কয়েকজন যুবক কারারুদ্ধ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

নাম	জন্মকাল	বন্দীকাল
যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	১৮৯৭	১৩।৩।১৮—১৫।১।২০
প্রফুল্ল চক্রবর্তী	১৮৯৭	১১।৯।১৭—২০।৮।১৯
দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস	১৮৯১	২৩।৬।১৭—৩।৩।১৯

নাম	জন্মকাল	বন্দীকাল
মহানন্দ দে	১৮৮২	৫।৮।১৮—৩০।৫।১৯
প্রমথ নাথ নন্দী	১৮৯১	৯।৮।১৬—৯।১০।১৭

অংশ গ্রহণ করেছিল। কালীকচ্ছের সংগঠনটিও ছিল সুদৃঢ়। কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার পর সতীশ রায় ও বিনয় দত্ত আত্মগোপন করে এখানে বাস করছিল। একরাত্রে অতর্কিত ভাবে তারা দুজন ধরা পড়ে গেল। বহু বাড়ী খানা-তল্লাশী হল, ধৃত হল আরও কয়েকজন কর্মী। সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ পাওয়া গেল যে, এই ধর-পাকড়ে সাহায্য করেছে সরাইলের আব্দুল খালেক পাঠান। গুপ্তচরকে যথোপযুক্ত সাজা দেবার দায়িত্ব নিল বিরাজ দেব। কালীকচ্ছের ১৫ বছর বয়স্ক এই ছেলেটি ১৯৩০ সালে অভয় আশ্রমের নেতৃত্বে তমলুকে লবণ আইন অমান্য করে কারারুদ্ধ হয়। মুক্তি পেয়ে স্বগ্রামে ফিরে যায় এবং অহিংসার পথ ত্যাগ করে বিপ্লবীদলে যোগ দেয়। বিরাজ দেব ও ধীরেন্দ্র চক্রবর্তী ১৯৩২ সালের ২০শে নবেম্বর রাত্রে গ্রামের এক রাস্তায় আব্দুল খালেককে গুলি করে। খালেক মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাকে মৃত মনে করে ধীরেন্দ্র চক্রবর্তী ও বিরাজ দেব পালিয়ে যায়। পরদিন ধীরেন্দ্র চক্রবর্তীকে পুলিস গ্রেপ্তার করে। এই মামলার বিচারে ধীরেন্দ্র চক্রবর্তীর দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও বিরাজ দেবের বিশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ধীরেন্দ্র চক্রবর্তী ও বিরাজ দেব উভয়েই আন্দামানে প্রেরিত হয়েছিল।

উক্ত ঘটনার পর ধরা পড়ার আগে কালীকচ্ছ থেকে গোপনে বিরাজ দেব শ্রীহট্টে পালিয়ে যায়। বৈপ্লবিক কাজ করার জন্য সে আমাদের কুমিল্লা কেন্দ্রের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে। সেখান থেকে অসিতরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিদ্যাধর সাহা, গৌরমোহন দাস, মনোমোহন সাহা ও মহেশ রায়কে শ্রীহট্টে নিয়ে আসে। অর্থের প্রয়োজন তীব্র হয়ে উঠায় উক্ত পাঁচ জনকে নিয়ে বিরাজ দেব ১৯৩৩

সালের ১৩ই মার্চ ইটাখোলা পোস্টঅফিসের মেলব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। হৈ চৈ শুনে গ্রামবাসীরা ওদের পিছে ধাওয়া করে এবং ধরে ফেলে। এই মামলার বিচারে অসিতরঞ্জনের মৃত্যুদণ্ড, বিরাজ মোহন দেব, গৌরমোহন দাস, বিদ্যাধর সাহা প্রত্যেকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। এদের বয়স যথাক্রমে ১৮, ১৬, ২০ ও ১৮ বছর। প্রত্যেকেই আন্দামানে প্রেরিত হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, উপরে উল্লিখিত দুটো মামলায় বিরাজ দেবের ৪৫ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ হয়। বীর সাভারকরের পরে এত দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ড আর কাহারও হয়নি। আদেশ হয়েছিল ধারাবাহিক দণ্ডের, আসাম ও বাঙ্গলা সরকারের আদালতের আলাদা বিচারে।

॥ শহীদ অসিতরঞ্জন ভট্টাচার্য ॥

অগ্নিহোত্রী অসিতরঞ্জন ভট্টাচার্যের জন্ম হয়েছিল ১৯১৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল লেসিয়ারা গ্রামে। গ্রামটি কুমিল্লা জিলার কসবা রেল স্টেশনের নিকটে। পিতা ক্ষীরোদমোহন ভট্টাচার্য, মাতা বিরজা সুন্দরী দেবী।

কসবাও কুটিতে আমাদের যে শাখা ছিল, যে আখড়া ছিল তাতে যোগ দিয়েছিল অসিতরঞ্জন। কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার পর দলের অনেক সদস্য গ্রেপ্তার হয়ে গেলে পর পার্টির কাজ চালিয়ে যায় অসিত খুব গোপনে। সে কুমিল্লা কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তার সঙ্গে গোপনে দেখা করে বিরাজ দেব কুমিল্লায় এবং পরামর্শের পর ইটাখোলা পোস্টাফিসের মেলব্যাগ অপহরণের ব্যবস্থা হয়। মেলব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালাবার পথে একজন লোক সড়কি ছুঁড়ে তার পা এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। অসিত ঘুরে দাঁড়িয়ে রিভলভার ছোড়ে, লোকটি মারা যায়। বিরাজও তার রিভলভার

থেকে গুলি ছুঁড়েছিল কিন্তু কেউ পালাতে সক্ষম হয়নি। অসিত মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে পড়ে। প্রায় মাইল খানেক রাস্তা পার হওয়ার পর তারা সকলে ধরা পড়ে।

১৯৩৩ সালের ২২শে জুলাই মামলা শুরু হয়, বিচার শেষ হয় ১৬ই জুলাই ১৯৩৪ সালে। কিন্তু জজ ও জুরি ভিন্নমত হওয়ায় চূড়ান্ত রায়ের জন্য নথিপত্র হাইকোর্টে প্রেরিত হয়। ১৯৩৫ সালের ২৪শে মে হাইকোর্টের রায়ে অসিতরঞ্জনের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। উচ্চ আদালতে লঘু দণ্ডের আবেদন পর্যন্ত নাকচ হল। মাত্র ১৯ বছর বয়সে তরুণ অসিতের ফাঁসি হল ২রা জুলাই ১৯৩৪ সালে সকাল ৫॥ টার সময় শ্রীহট্ট জেলে বিপুল পুলিসী সমাবেশে প্রবল সতর্ক পরিবেশে। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে অসিতরঞ্জন বলেছিল—"হে ভারতবাসী বন্ধুগণ! আমি দেশ মাতৃকার বেদীমূলে নির্ভয়ে স্বাধীনতার জন্য আত্মবলি দিতেছি, তোমরাও এর জন্য প্রস্তুত হইবে—বন্দেমাতরম্।"

বন্দী পরিবৃত জেলেরও চারদিকে সঙ্গে সঙ্গে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠে। অন্ত্যেষ্টির জন্য অসিতের মৃতদেহ আত্মীয়দের অনুরোধ সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ দেয় নি।

॥ জ্যোতিকণা দত্ত ॥

উল্লাসকরের দাদা মোহিনীমোহন দত্তের মেয়ে জ্যোতিকণা আমাদের গ্রামেরই কন্যা। জ্যোতিকণা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ১৯১৩ সালের জানুয়ারী মাসে। কলকাতা ডায়োসেসান কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী, থাকতেন ডায়োসেসানের বোর্ডিং-এ। তার বাক্সে পাওয়া গেল দুটো রিভলভার, দুটো পিস্তল ও ৫৩টা কার্তুজ। ১৯৩৩ সালের ২৫শে অক্টোবর অস্ত্র আইনে জ্যোতিকণার চার বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর তিনি ডাক্তারী পাস করেন। বর্তমানে ইংলণ্ডে বাস করছেন।

এমনি ধারা গ্রামের আরও অনেক যুবক বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—উষা দে, শিবেন্দ্র চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত, শিবু দত্তগুপ্ত, সুখু দত্তগুপ্ত, বিশু দত্ত, শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্য, চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পরেশ রায়, অতীশ রায়, উষা তলাপাত্র, বিনোদ তলাপাত্র, শচী ভট্টাচার্য, শারদা চক্রবর্তী, শ্রীমতী বকুল ভট্টাচার্য, শ্রীমতী বীণা তলাপাত্র, অমৃত বর্ধণ, লাল মোহন বর্ধণ, অনাথ বর্ধণ, সুখলাল চৌধুরী, বিমল নন্দী, বিনয় নন্দী, অমিয় নন্দী, মনোজ নন্দী, কানু ভট্টাচার্য, সুকুমার নন্দী, সমরেন্দ্র নন্দী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিজয় নন্দী, শ্রীমতী নীলিমা নন্দী, নলিনী ভট্টাচার্য, ক্ষীরোদ কর, অমিয় ভট্টাচার্য, চারু নন্দী, হরিকিশোর চক্রবর্তী, নীরোদ চক্রবর্তী, কার্তিক চক্রবর্তী ও কানাই সরকার।

এখানে কালীকচ্ছের কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তির পরিচয় দেব।

॥ কৈলাসচন্দ্র সিংহ ॥

কৈলাসচন্দ্র সিংহ বাল্যকাল হতেই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। ১২৮৩ সালে 'ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত' প্রকাশ করেন। বাঙ্গলা ভাষায় ইহাই সর্বপ্রথম জেলার ইতিহাস। "কৈলাস বাবুর নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন"—(রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৭০)।

পরে কৈলাসচন্দ্র ফরাসী বীরাঙ্গনা জোয়ান অফ আর্কের জীবনী রচনা করেছিলেন। ১২৮৭ সন থেকে আরম্ভ করে ১৩১৮ সন পর্যন্ত তিনি ভারতী, নব্যভারত, সাহিত্য, ঢাকা রিভিউ প্রভৃতি পত্রিকায় গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ঐতিহাসিক গবেষকরূপে কৈলাসচন্দ্র মহাশয়ের খ্যাতি পণ্ডিত সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

রজনী নন্দী কুমিল্লায় ওকালতি করতেন এবং Tippera Guide নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

দত্ত বংশের দাতা গোপীনাথ দত্তের নাম না করলে কালীকচ্ছের কথা বলা শেষ হয় না। দাতা হিসাবে তিনি এত খ্যাতিলাভ করেছিলেন যে, তাঁকে লোকে দাতা গোপীনাথ বলত। তাঁর সম্বন্ধে নানা রকম কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। একদিন তিনি পুকুর থেকে স্নান করে ফিরছেন হঠাৎ এক ভিখারী এসে সামনে দাঁড়াল, তার কিছু চাই, কিন্তু দেবার মত সঙ্গে কিছু ছিল না। গোপীনাথ কিছুক্ষণ ভাবলেন তারপর গামছাটি পরে ধুতিটি দিয়ে দিলেন ভিখারীকে।

॥ দ্বিজদাস দত্ত ॥

দ্বিজদাস দত্ত সর্বপ্রথম এদেশ থেকে কৃষিবিদ্যা, অধ্যয়ন করার জন্য বিলেতে গিয়েছিলেন, দেশে ফিরে এসে তিনি বিভিন্ন কলেজের কৃষি বিভাগের অধ্যাপনার কাজ করেন। তিনি চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি ব্রাহ্মধর্মের দিকে আকৃষ্ট হন এবং ডাঃ মহেন্দ্র নন্দীর বোন মুক্তকেশীকে ১২৮৪ সালের বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মমতে বিয়ে করেন। দ্বিজদাস দত্তের পিতা গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। ব্রাহ্ম মেয়ের সঙ্গে বিয়ে বন্ধ করার জন্য দ্বিজদাস বাবুকে তাঁর পিতা ঘরে তালা দিয়ে আটকে রেখেছিলেন। কিন্তু দ্বিজদাস বাবু গভীর রাত্রে তালা ভেঙ্গে বাড়ী থেকে পালিয়ে যান মহেন্দ্র নন্দীর বাড়ীতে এবং মুক্তকেশীকে বিয়ে করেন।

দ্বিজদাস বাবু অবসর গ্রহণ করার পরে অনেক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'পাট বা নালিতা', 'শঙ্করাচার্য ও শঙ্কর দর্শন' (প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ), 'বেদমাতা মানবমণ্ডলীর আদিম ধর্মমাতা', 'বেদমাতার সেবা', 'ঋগ্বেদ' (১ম ভাগ), 'Peasant Proprietorship in India', 'ভোটের কথা', 'বৈদিক সরস্বতী ও লক্ষ্মী', 'স্বরাজের সিঁড়ি', 'চরিত্রমূলক যৌথ ধনভাণ্ডার', 'কোরাণের সুরা ও বেদের সুক্ত সংগ্রহ', 'বৈদিক জাতি-তত্ত্ব।' পুস্তকের নামগুলিতেই তাঁর চিন্তা ধারার ও পণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিলেতে হাইড পার্কে যে

ধরণের বক্তৃতা হয় তিনি প্রায়ই সেই ধরণের বক্তৃতা দিতেন কুমিল্লা টাউন হলের সামনে, রাস্তার ধারে। কোন প্রস্তুতি নেই, ঘোষণা নেই, একজায়গায় দাঁড়িয়ে দু'চারজন লোকের সামনেই শুরু করতেন বক্তৃতা, একটু পরেই ভিড় জমে যেত তাঁর চার পাশে। তিনি প্রচার করতেন, হিন্দু-মুসলমান ও ক্রিশ্চান ধর্মের সমন্বয়। তিনি এই উদ্দেশ্যে আরবী, ফার্সী, প্রাকৃত, পালি প্রভৃতি ভাষা শিখে গীতা, কোরাণ, বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন। বক্তৃতা ও পুস্তিকাদির মাধ্যমে তিনি তাঁর মতবাদ প্রচার করে গেছেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। তাঁরই ছেলে বোমবিশারদ উল্লাসকর দত্ত।

—দুই—

॥ **নন্দীবংশ** ॥

প্রায় আটশ বছর পূর্বে বর্ধমান জেলা থেকে মহিধর নন্দীরায় কালীকচ্ছে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর একমাত্র পুত্র বাজীন্দ্র নন্দীরায়ের সাতাশটি পুত্র ছিল। একদিন এই ছেলেরা 'রণখলা'য় খেলা করতে করতে মারামারি শুরু করে দেয়। কোলাহল শুনে বাজীন্দ্র নন্দী 'রণখলা'য় যান এবং সব দেখে-শুনে বুঝতে পারলেন এদের এক সঙ্গে রাখলে মারামারি করে নন্দীরায় বংশই ধ্বংস করে দেবে। তাই তিনি সুলক্ষণযুক্ত দুটি পুত্রকে তাঁর কাছে রেখে বাকী পঁচিশজনকে "একজন ধাই ও একটি গাই" এবং যথোপযুক্ত টাকা-পয়সা দিয়ে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিলেন।

বাজীন্দ্র নন্দীর দ্বিতীয় ছেলে গণপতি নন্দীরায়ের উত্তর পুরুষ আমি। আমার প্রপিতামহ রমানাথ নন্দীর স্ত্রী সহমৃতা হয়েছিলেন। রমানাথের কাকা কালারামের স্ত্রীও সহমৃতা হয়েছিলেন। আমার প্রপিতামহের পিতা রামপ্রসাদ নন্দী একটি সাত মহল্লা বাড়ী তৈরী করেছিলেন, তাকে লোকে "রামপ্রসাদের রামের পুরী" বলত। এই 'রামের পুরী'র ভগ্নাবশেষে নির্মিত বাড়ীতেই আমার জন্ম। বাড়ীতে ছিল প্রচুর ফুল ও সবরকম ফলের গাছ, পুবদিকে একটি ও পশ্চিমদিকে আরেকটি পুকুর ছিল। ঐ পুকুর পাড়ে বাস করত যারা তারা ছিল আমাদের প্রজা। বিবাহে পূজা-পার্বনে বিনা পারিশ্রমিকে তারা আমাদের বাড়ীতে কাজ করত। এরকম আরও প্রজা ছিল আমাদের যাদের কাছ থেকে খাজনা পেতাম আমরা।

এবার কালীকচ্ছের নন্দীবংশের কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তির পরিচয় দিচ্ছি—

॥ রামদুলাল নন্দী ॥

রামদুলাল নন্দী জগন্মাতা কালীর উপাসক ছিলেন। তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও পার্শী পড়তে ও লিখতে পারতেন। ত্রিপুরার রাজার দেওয়ান ছিলেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। বহু অর্থ ব্যয় করে তিনি একটি পাকা বসত বাড়ী, বাগান ও পুকুর নির্মাণ করেন। বাড়ীতে কোঠাই ছিল কুড়িটি, পুকুরে বাঁধানো ঘাট ছিল। একদিন গুরু এলেন বাড়ী দেখতে। বাড়ী দেখে বল্লেন—"দুলাল, বাড়ীখানা বেশ হয়েছে, বেশ সুন্দর।"

ঐ কথা শুনেই রামদুলাল বাড়ীখানা গুরুকে দান করে ফেল্লেন। গুরুদেবের আপত্তি শুনলেন না। ১২৫৪ সালের ১৬ই বৈশাখ দানপত্র সম্পন্ন করে দিলেন। এই খবর শুনে ত্রিপুরার রাজা তাঁর দেওয়ানের জন্য একখানা নূতন বাড়ী তৈরী করে দিয়েছিলেন। সেই বাড়ীটি 'দেওয়ানবাড়ী' নামে খ্যাত।

রামদুলাল অনেক ধর্মসঙ্গীত রচনা করেন, তাঁহার মালসী গান খুব জনপ্রিয় ছিল। এই গান তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখে গেছে। রামদুলাল ১২৫৮ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন।

॥ আনন্দ নন্দী ॥

রামদুলাল নন্দীর পুত্র আনন্দ নন্দী ১২৩৯ সালের ১১ই বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা ইংরেজী, পার্শী, সংস্কৃত, হিন্দী ও উর্দু ভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন। বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী ও উর্দু ভাষায় তিনি বহু সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তাঁর অগণিত ভক্তরা এইসব সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হত, আনন্দ পেত ও ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ হত।

তাঁর পিতার ধর্ম গ্রহণ করে শাক্তমতে তিনি প্রথম জীবনে দীক্ষা নিয়েছিলেন। জনশ্রুতি এই যে একদিন এক জুয়াচোর তাঁকে বলে যে টাকা মোহর করে দিবার বিদ্যা তার আয়ত্তে আছে। সরল

মানুষ আনন্দ নন্দী একথা বিশ্বাস করে কয়েক হাজার টাকা জুয়াচোরটির হাতে তুলে দেন ও টাকা মোহর করার জন্য একটি কোঠায় বন্ধ করে রাখেন। পরদিন ঘর খুলে দেখতে পান জুয়াচোর সব টাকা নিয়ে উধাও হয়ে গেছে। এই ঘটনার পর থেকে তিনি খুব অর্থকষ্ট ও মানসিক অশান্তি ভোগ করতে থাকেন।

১২৭৩ সালে ঢাকায় পূর্ব বাংলা ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন তাঁর ভ্রাতা কৈলাসচন্দ্র নন্দী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সহ তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। ১২৭৬ সালে বিজকৃষ্ণ গোস্বামী, বঙ্গচন্দ্র রায় প্রভৃতিকে নিয়ে এসে কালীকচ্ছে সর্বপ্রথম ব্রহ্ম উৎসব পালন করেন। ঐ সময় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কিছুদিন আনন্দ নন্দীর বাড়ীতে ছিলেন।

১২৮৩ সালে আনন্দ নন্দী কলিকাতা গেলেন সেখানে ব্রহ্মর্ষি কেশবচন্দ্র সেন, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্ম বন্ধুদের সঙ্গে মিলে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশে। কিন্তু কলিকাতায় তিনি সর্বধর্ম সমন্বয় নিমিত্ত 'দয়াময়' নাম প্রচার করার জন্য ঈশ্বরের আদেশ পান এরকম প্রবাদ আছে। তারপর থেকে 'দয়াময়' নাম প্রচার করতে আরম্ভ করেন ও বহু শিষ্যকে দীক্ষা দেন। তাঁর শিষ্যের সংখ্যা ছিল সাড়ে দশ হাজার। দয়াময় নাম প্রচারের জন্য তিনি কয়েক শত সঙ্গীত ও কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন। কিছু সংখ্যক সঙ্গীত প্রকাশিত হয়েছে "সর্বধর্ম গীত" (১ম ভাগ ও ২য় ভাগ) পুস্তকে। তাঁর রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য "প্রকৃত তত্ত্ব" ও "সর্বধর্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালী"। তাঁর রচিত সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁহার পুত্র ডাঃ মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী লিখেছেন—"এই সকল সঙ্গীত মানবীয় জ্ঞান ও বুদ্ধিযোগে প্রকাশিত হয় নাই, এই সকল সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ঈশ্বরীয় বাণী জগতে প্রকাশিত হইয়াছে।...এই সকল সঙ্গীত লিখিবার সময় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন এবং চক্ষুর সাহায্য ব্যতিরেকেই তাঁহার হস্ত এই সকল সঙ্গীত লিখিয়া যাইত।...এই সকল গানের অধিক সংখ্যক ১২৯১ সনে প্রাত্যহিক উপাসনার সময় লিখিত হইয়াছে।"

শেষ জীবনের পাঁচ-ছ বছর তিনি নিজ বাড়ির আমবাগানে একটি গাছের নীচে বসে সাধনায় দিনরাত মগ্ন থাকতেন। দেহ ত্যাগের কিছুদিন আগে শিষ্যদের জানালেন—"আমাকে আর অনেকদিন দেখিতে পাইবে না, এখানেই অদৃশ্য হইয়া থাকিব।"

১৩০৭ সালের বৈশাখ মাসে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হলে তাঁহার স্ত্রী জয়দুর্গা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আনন্দ নন্দী দেহত্যাগ করলে তাঁর কি হবে? জবাবে তিনি নাকি বলেছিলেন—"তিন দিনের মধ্যেই তুমিও আমার কাছে আসিবে।" এটা জনশ্রুতি।

আনন্দ নন্দী ১৩০৭ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ রাত ১১টায় সেই গাছের নীচে দেহত্যাগ করেন। স্ত্রী জয়দুর্গা ১৪ই জ্যৈষ্ঠ রাত ৮টায় স্বামীর সঙ্গে মিলিত হন। স্বামী-স্ত্রীকে একই স্থানে ঐ গাছের নীচে সমাধিস্থ করা হয়। পরবর্তীকালে মহেন্দ্র নন্দী ঐ সমাধির উপর এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করেন। 'আচার্য মহারাজ আনন্দ স্বামী' নামে তিনি খ্যাত ছিলেন।

আনন্দ নন্দীর অগণিত শিষ্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় মনোমোহন দত্তের নাম। যদিও তিনি বেশী শিক্ষিত ছিলেন না, বার বার চেষ্টা করে মোক্তারী পরীক্ষাও পাস করতে পারেননি, কিন্তু আনন্দ স্বামীর দয়ায় অভূতপূর্ব কবিত্ব শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর রচিত সঙ্গীতগ্রন্থ 'মলয়া' (১ম ও ২য় খণ্ড) পণ্ডিত সমাজেও প্রশংসিত হয়েছিল। তাঁর রচিত অন্য দুটো পুস্তকের নাম—'ময়না বা পাগলের প্রলাপ' ও 'পথিক ও পাথেয়'। তিনি সাধক ছিলেন, কবিও ছিলেন।

দেশবিখ্যাত ওস্তাদ আপ্তাবদ্দিন স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর কৃপায় বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

॥ ডাঃ মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ॥

"দেশবিখ্যাত স্বদেশ প্রেমিক পরোপকারী কর্মী ব্রাহ্ম সাধক ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ২৫শে আষাঢ় ১৩৩৯ অপরাহ্ন প্রায় সাড়ে ছয়

ঘটিকার সময় দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১২৬০ সনে তার জন্ম হয় (অন্য মত ১২৬১ সনের ৮ই অগ্রহায়ণ)। ১৮৭১ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসর ঢাকা কলেজে এবং প্রায় পাঁচ বৎসর কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহার পিতা শ্রীমদাচার্য্য আনন্দ নন্দী (আনন্দ স্বামী) সাংসারিক কর্মে একেবারেই বিরত এবং সর্বদা ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন এই খবর পাইয়া তিনি ১২৮৩ সালে বাড়ী চলিয়া আসেন। পরে তিনি তিন বৎসর ঢাকা হানিম্যান মেডিকেল স্কুলে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি বাড়ী ফিরিয়া চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। অল্পকাল মধ্যেই একজন বিখ্যাত চিকিৎসক বলিয়া গণ্য হন। তিনি মাসে সাত-আটশত টাকা উপার্জন করিতেন কিন্তু সমস্তই পরোপকার ও লোক সেবায় ব্যয়িত হইত।

"কলিকাতায় অবস্থান কালে যখন স্বদেশীর নামগন্ধও লোকে জানিত না তখন (১৮৭২-৭৬) তিনিই লিখিবার কালি, ছাপাখানার কালি, কাপড়ের কল, দিয়াশলাইয়ের কল নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করেন।

"নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক হিন্দুমেলা স্থাপিত হইলে, তাহাতে তিনি তাঁহার কলে প্রস্তুত একখানা কাপড়, লিখিবার কালি ও দিয়াশলাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার কলে প্রস্তুত করা কাপড়খানা দেখিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি সেই সামান্য কাপড়খানা মাথায় বাঁধিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তুত লিখিবার কালি কলিকাতার বাজারে রায় ব্রাদার্স ইঙ্ক নামে বিক্রয় হইত।

"১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কালীকচ্ছ গ্রামের মধ্যস্থলে প্রায় আট বিঘা জমির জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তথায় গৃহাদি নির্মাণ করিয়া তিনি এক লোহার কারখানা স্থাপন করেন। ইহাতে উৎকৃষ্ট ছুরি, কাঁচি, চা-গাছ কাটিবার চাকু ইত্যাদি প্রস্তুত হইত। অর্থাভাবে কারখানা উঠিয়া যাওয়ার

পর তিনি যন্ত্রাদি নিজ বাড়িতে আনিয়া কাজ চালাইয়াছিলেন। তিনি দিয়াশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স প্রস্তুত করিবার কল আবিষ্কার করিয়া দিয়াশলাই প্রস্তুত করিবার একটি কারখানা স্থাপন করেন। ইহাতে উৎকৃষ্ট দিয়াশলাই প্রস্তুত হইত। বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে এই কল সরবরাহ করিবার অর্ডার আসিলে তিনি তাঁহার লোহার কারখানায় অনেকগুলি দিয়াশলাইয়ের কল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাঁহার এই কলের সংবাদ পাইয়া ইহা দেখিবার জন্য রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার মিঃ মোনাহান এবং মিঃ বীটসন্ বেল তাঁহার বাড়িতে আসেন এবং এই কলের প্রশংসা করিয়া ইহা পেটেন্ট করিবার জন্য তাহাকে পরামর্শ দেন।

"জুগীদিগকে তিনি সহজে কাপড় বুনিবার প্রণালী শিক্ষা দেন। তাঁহার বাড়ীতে সাত আটখানা তাঁতে দেশী কাপড় বুনা হইত। চরকায় সূতা কাটাও হইত। ইহা স্বদেশী যুগের বহু পূর্বের কথা। স্বদেশী-আন্দোলনের সময় মহেন্দ্রবাবুর প্রতিষ্ঠান সমূহ দেখিবার জন্য ও স্বদেশী প্রচার করিবার জন্য শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ স্বদেশী নেতাগণ তাঁহার বাড়িতে আসিয়াছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্রের তপস্বীজীবন ও তাঁহার কার্যাদি দেখিয়া অরবিন্দবাবু ও বিপিনবাবু অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতীক ও বঙ্গের তল্‌স্তয় বলিয়া অভিহিত করেন।

"গত পঞ্চাশ বৎসরের উর্দ্ধকাল তিনি দেশী মোটা কাপড় পরিধান করিয়া গিয়াছেন। অন্য কোন কাপড় পরিতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই। এইরূপ দৃষ্টান্ত সমস্ত ভারতবর্ষে বিরল।

"তিনি তাঁহার পিতামাতার সমাধিস্থিত কুটীরে এবং তৎপরে নির্মিত বৃহৎ মন্দিরের এক কোণে বাস করিয়া ধর্ম সাধন করিতেন। প্রতিদিন প্রাতে আরতি কীর্ত্তন ও ব্রহ্মধ্যান না করিয়া কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন না—পর্বতের ন্যায় অটল স্থির থাকিতেন।

"সাম্যভাব তাঁহার জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। জাতিভেদ

ও অস্পৃশ্যতা বর্জন-মাত্র এক গ্লাস জলপানে পর্য্যবসিত হয় নাই। উৎসবাদি উপলক্ষ্যে আগত নানা নিম্নজাতীয় লোককেও তাঁহার সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিতে দেখা গিয়াছে—এখানে উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন বিচার ছিল না, অতি ঘৃণিত ব্যক্তিও তাঁহার নিকট আশ্রয় লাভ করিত।

"তাঁহার একটি মহৎ কাজ নির্য্যাতিতা, পীড়িতা পরিত্যক্তা বহুনারী আসিয়া তাঁহার নিকট আশ্রয় লাভ করিয়াছেন ও শান্তি পাইয়াছেন। সমাজ ও আত্মীয় স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্তা বহুনারী তাহার আশ্রয়ে আসিয়া উচ্চতর আদর্শ জীবন যাপন করিয়াছেন। এই প্রকার নারীদের অনেককে তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠান অনুযায়ী বিবাহ দিয়াছেন এবং তাঁহারা সাধু জীবন যাপন করিতেছেন। অধুনা এইরূপ নারীদের জন্য আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহাদের জন্য কোন আশ্রম ছিল না।

"তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য তাঁহার বাড়ির সংলগ্ন এক স্থানে "মহেন্দ্র চন্দ্র অনাথ আশ্রম" নামক একটি প্রতিষ্ঠান শীঘ্রই স্থাপিত হইবে।" (প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩৩৯।)

মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মৃত্যুর পর প্রবাসীতে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল তা উপরে উদ্ধৃত হল।

মহেন্দ্রবাবুর কাপড়ের কল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'জীবন স্মৃতি'তে লিখেছেন "খবর পাওয়া গেল, একটি কোনো অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত; গেলাম তাহার কল দেখিতে। সেটা কোনো কাজের জিনিস হইতেছে কিনা তাহা কিছু মাত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না, কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহারো চেয়ে খাটো ছিলাম না। যন্ত্র তৈরি করিতে কিছু দেনা হইয়াছিল আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম। অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন "আমাদের কলে এই গামছার টুকরা তৈরি হইয়াছে।"

রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন— "নন্দী পরিবারের ইতিহাস শুনিবার মতো। মহেন্দ্র নন্দী যখন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পড়েন তখন নিজের তাঁতে কাপড় বনন করেন। 'জীবন স্মৃতি'তে ব্রজবাবুর বস্ত্রখণ্ড লইয়া যে আনন্দের কথা আছে, সেই বস্ত্রখণ্ড বনন করেন মহেন্দ্রচন্দ্র।" (ত্রিপুরার কথা)

মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর দেশলাইয়ের কল প্রস্তুত করার প্রয়াস সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ 'জীবন স্মৃতি'তে লিখেছেন "স্বদেশে দেশলাই প্রভৃতি কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল।...অনেক পরীক্ষার পর বাক্স কয়েক দেশলাই তৈরী হইল। আমাদের এক বাক্সে যে খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলা ধরানো চলিত। আরও একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না।" (পৃঃ ৬৯)

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহেন্দ্র নন্দীর চেষ্টা ও অধ্যবসায় ব্যর্থ হয় নি। পরবর্তী কালে তিনি ভারতে প্রথম দেশলাইয়ের কল আবিষ্কারের কৃতিত্ব ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর তৈরী কল নিয়ে কুমিল্লা, বোম্বাই, করাচী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। আমার দাদা অমূল্যচন্দ্র নন্দী আমাদের বাড়ীতে একটি দেশলাইয়ের কল স্থাপন করেছিলেন। ছোট বেলায় এই কুটির শিল্পে নিজেও অবসর সময়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ১৯২০-২১ সালে কলকাতার একজিবিশনে এই কল প্রদর্শিত ও উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল।

মহেন্দ্র বাবু যে সময় মেডিকেল কলেজে পড়তেন সে সময় ফিরিঙ্গি ছাত্রদেরই প্রাধান্য ছিল। কলেজে সামনের আসনে বসার জন্য মহেন্দ্র বাবুকে প্রায়ই গোরা ছাত্রদের বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। একদিন কথা-কাটাকাটির পর মারামারি শুরু হয়ে যায়। তিনি একটি ছাত্রকে মার দিলে ক্লাসের সব ফিরিঙ্গি ছাত্র তাকে তাড়া করে

গোলদীঘিতে নিয়ে যায়। আত্মরক্ষার জন্য মহেন্দ্রবাবু জলে নামতে বাধ্য হন। একা একটি ছেলেকে এতগুলো ফিরিঙ্গি ছেলে আক্রমণ করছে দেখে কয়েকজন গোরা মহিলা 'শেম' 'শেম' চীৎকার করে উঠে, তখন ঐ ছেলেগুলো লজ্জিত হয়ে পালিয়ে যায়। মহেন্দ্রবাবুর মেডিকেল কলেজ ছেড়ে দেবার এটাও একটা কারণ বলে গুজব শোনা যায়।

তিনি বাড়ী ফিরে গিয়ে পিতার হাত থেকে ১২৮৪ সালে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির দায়িত্ব নিলেন। পরে গ্রামেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই চিকিৎসক হিসাবে বেশ খ্যাতি লাভ করেন। শুধু গ্রামের নয় বিভিন্ন জেলার লোক আসত তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্য। বর্ষাকালে ভিড় হত সবচেয়ে বেশী, তাঁর বাড়ীর পাশের খালটিতে নৌকোর লাইন লেগে যেত। তিনি নিজেও রুগী দেখার জন্য বিভিন্ন জায়গায় এমন কি কলকাতা পর্যন্ত যেতেন। চিকিৎসক হিসেবে তার যশ কলকাতার ডাক্তার বিধান রায়ের মত দূর দূরান্তরে বিস্তৃত ছিল। লোকে তাকে ধন্বন্তরি মনে করত। বিশ্বাস করত যমের মুখ থেকে মুমূর্ষু রুগীকে তিনি ফিরিয়ে আনতে পারেন। আমাকে নাকি তাই করা হয়েছিল। আমার বয়স যখন পাঁচ বছর তখনকার দিনের দুরারোগ্য টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়েছিলাম। চল্লিশ দিন যমের সঙ্গে লড়াই করে তিনি আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। তিনি আমাকে বাঁচালেন বটে কিন্তু আমার নধরকান্তি দেহখানি নাকি চিরকালের জন্য হারিয়ে গেল।

মহেন্দ্র নন্দীর খ্যাতির ফলে আমাদের গ্রামে অনেকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করে। মহেন্দ্রবাবুর এক ছেলে বিবেক নন্দীও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

মহেন্দ্র নন্দী চিকিৎসা করে যে অর্থ লাভ করতেন তা সবই পরোপকারে ও দৈনিক অতিথি ও ভক্তদের খাওয়াবার জন্য ব্যয় করতেন। তিনি যে টাকা দৈনিক পেতেন তা ট্যাঁকে গুঁজে রেখেই

খরচ করতেন, তার কোন ক্যাশ বাক্স ছিল না। খুব সহজ সরল জীবন যাপন করতেন।

এসম্বন্ধে নীরোদ চৌধুরীর বই থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

"He lived in this manner without ever seeking or drawing the wider world's notice. But I was glad to see that after his death the famous Bengalee Nationalist orator and writer Mr. Bepin Chandra Pal, described him as a Tolstoy like character. I shall put on record my curious feeling about him. As soon as I heard of Mahatma Gandhi and his characteristic activities soon after his return from South Africa, I involuntarily recalled Mahendrā Babu.........

.........Mahendra Babu had inherited the religious leadership of his father and giving up the fine brick house left by his grandfather, was living near the grave of his father in very humble sheds which had come to be known collectively as Under the Trees.......
...Mhendra Babu when I first saw him wore long hair and always went about barebodied and in later life his hair became matted and coiled in the manner of Indian Sadhus. Thus by virtue both of his secular and his spiritual vocation he could be called a 'medicine man.'

"He was spending all his fortune in setting up machinery and workshop in his house. Whenever we went there, we found to our intense interest and excitement, some machines or other working. He worked on the scale and principle of cottage industries and had set some of his sons to this work."

(বৃহত্তর জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ বা সন্ধান না করে তিনি এই ভাবে জীবন যাপন করতেন। কিন্তু আমি দেখে খুশি হয়েছিলাম যে

তাঁর মৃত্যুর পরে বিখ্যাত বাঙ্গালী স্বদেশীবক্তা ও লেখক শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল তাঁকে তলস্তয়ের ন্যায় চরিত্রসম্পন্ন বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অদ্ভুত অনুভূতি ব্যক্ত করছি। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মহাত্মা গান্ধীর প্রত্যাবর্তন এবং তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্যাবলীর কথা যেই শুনলাম অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমার মহেন্দ্রবাবুকে মনে পড়ল।

মহেন্দ্রবাবু তাঁর পিতার ধর্মীয় নেতৃত্বের উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন। পিতামহের ইষ্টক নির্মিত সুন্দর অট্টালিকা পরিত্যাগ করে তিনি পিতার সমাধিস্থানের নিকট এক অতি সাধারণ কুটিরে বাস করতেন। যাকে সাধারণভাবে বলা চলে 'বৃক্ষতলে বাস'।

মহেন্দ্রবাবুকে যখন আমি প্রথম দেখি, তখন তাঁর বড় বড় চুল ছিল এবং খালি গায়ে ঘুরে বেড়াতেন। পরবর্তীকালে মাথায় জটা হয়েছিল এবং ভারতীয় সন্ন্যাসীদের মতো চুড়ো বাঁধা থাকত। তাঁর আধ্যাত্মিক ও ধর্ম সম্প্রদায় নিরপেক্ষ জীবিকার্জনের জন্য, গুণাবলীর জন্য তাঁকে 'পরিত্রাতা চিকিৎসক' বলা যেতে পারে।

তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ নিজের গৃহে কলকারখানা নির্মাণে ব্যয় করতেন। যখনি আমরা সেখানে যেতাম তখনি গভীর আগ্রহ ও উত্তেজনার সঙ্গে লক্ষ্য করতাম যে, কোন না কোন কল বা কাজ চলছে। কুটিরশিল্প গড়ে তোলার নীতিতে তিনি কর্মে রত ছিলেন এবং নিজের কয়েকটি সন্তানকে এই কর্মে নিযুক্ত করেছিলেন।'

নিজের প্রতিভাবলে তিনি চিকিৎসক হিসাবে, বিজ্ঞানী হিসাবে দেশ প্রেমিক হিসাবে, সাধক হিসাবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। লোকে তাকে ক্ষণজন্মা বলত।

মহেন্দ্র নন্দীর বাড়ীটি ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। তিনিই ছিলেন তার প্রধান হোতা। তিনি ছিলেন আলিপুর বোমার মামলা খ্যাত অশোক নন্দীর পিতা ও উল্লাসকর দত্তের মামা।

॥ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে কালীকচ্ছ ॥

১৯০৪ সনে ডাঃ মহেন্দ্র নন্দীর নেতৃত্বে আমাদের গ্রামে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। সেদিন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি আন্দোলনে আমাদের গ্রাম অংশ নিয়েছে, কারাবরণ করেছে অনেক যুবক, অত্যাচারিত হয়েছে অনেক পরিবার।

১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ দিবসে কালীকচ্ছে পালিত হয়েছিল অরন্ধন ও রাখীবন্ধন। মার কাছে শুনেছি সেদিন আমাদের বাড়ীতেও উনুন ধরানো হয়নি। মহেন্দ্র নন্দী ও তাঁর পুত্র বীরেন্দ্র নন্দী, বিবেক নন্দী, অশোক নন্দী, তাঁর ভাগিনেয় ধরণী গুপ্ত, তারিণী গুপ্ত ও রসিক নন্দী প্রভৃতির নেতৃত্বে আমাদের গ্রামে সভা-সমিতি, স্বদেশী প্রচার, বিলাতী বর্জনের জন্য পিকেটিং ইত্যাদি হয়েছিল। কুমিল্লায় তখন যে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তার শিক্ষকতার ভার নিয়েছিলেন মহেন্দ্র নন্দীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্র নন্দী।

১৯০৬ সালে বরিশাল প্রাদেশিক কনফারেন্স পুলিস বে-আইনী ঘোষণা করে ভেঙ্গে দেবার পর বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅরবিন্দ ও উল্লাসকর দত্ত কুমিল্লায় সভাসমিতি করে কালীকচ্ছে গেলেন। তাঁরা ডাঃ মহেন্দ্র নন্দীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই স্বদেশী নেতাদের আগমন উপলক্ষে কালীকচ্ছে এক বিরাট জনসভার আয়োজন হয়। আশেপাশের চুন্টা, কুণ্ডা, সরাইল প্রভৃতি গ্রাম থেকে বহুলোক এই সভায় যোগদান করেছিল। ওই অঞ্চলে ইতিপূর্বে এতবড় জনসভা কখনও হয়নি। বিপিনচন্দ্র পাল প্রায় দুই ঘণ্টা বক্তৃতা করেন, ইংরেজের শোষণ ও কুশাসনের বিবরণ দেন এবং দেশবাসীকে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দিবার জন্য আহ্বান জানান। তাঁর বক্তৃতার ফলে সারা অঞ্চলে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য জাগে, সকলেই উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে দেশপ্রেমে।

পরদিন স্থানীয় যুবকদের নিয়ে এক ঘরোয়া সভা করলেন শ্রীঅরবিন্দ ও উল্লাসকর দত্ত। তাঁদের বক্তব্য ছিল শুধু বিলাতী বর্জনেই

দেশের মুক্তি আসবে না, তার জন্য আরও বেশী আত্মত্যাগ ও কঠোর সাধনার প্রয়োজন।

১৯০৮ সালে চাঁদপুরে এক রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন ডঃ মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত দেশনেতা হরদয়াল নাগ।

এইসব সম্মেলনের ফলে দেশের মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগে। ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সংগঠন, জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠতে থাকে। কবি মুকুন্দ দাসের স্বদেশী গান ও যাত্রা লোকের মনে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপ দিল শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মানুষ।

কালীকচ্ছের যুবকদের নিয়ে আনন্দমঠের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত 'সন্তান সমিতি' গঠন করলেন ডাঃ বিবেক নন্দী। কুমিল্লা শহরে অনুশীলন সমিতির প্রচারকর্মও সংগঠন কালীকচ্ছকে প্রভাবিত করে। তাই আমাদের গ্রামেও ব্যায়ামচর্চা ও লাঠিখেলার জন্য ক্লাব বা আখড়ার প্রতিষ্ঠা হল। কিন্তু আমাদের গ্রামের লাঠিখেলাটা 'শির মুণ্ডা' ধরণের ছিল না। নিকটবর্তী সরাইল গ্রামবাসী মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ধরণের লাঠিখেলা হত ঢোল-বাদ্য ও নৃত্য সহযোগে। এই লাঠিখেলাটা সাধারণতঃ মুসলমানরা তাদের প্রতি পরব উপলক্ষ্যে দেখাত। খুব উৎসাহ নিয়ে গ্রামের যুবকরা এই লাঠিখেলা শিখতে লাগল এবং অন্যান্য গ্রামেও লাঠিখেলা শেখাবার জন্য আমন্ত্রিত হত। লাঠিখেলায় খুব পারদর্শী ছিলেন রসিক নন্দী, বিবেক নন্দী, তারিণী গুপ্ত, ধরণী গুপ্ত।

ধরণী গুপ্ত ধৃত হয়েছিলেন অশোক নন্দী ও উল্লাসকর দত্তের সঙ্গে ১৯০৮ সালে কলকাতায়।

অস্ত্র আইনে ধরণী গুপ্তের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

॥ অশোক নন্দী ॥

মানিকতলা বাগানে পুলিসের দৃষ্টি পড়েছে নানা ঘটনায় এ সন্দেহ হওয়ায় বাগানবাড়ী হতে উল্লাশকর বোমা এবং বোমা তৈরীর মালমশলা একটি ট্রাঙ্কে পুরে নিরাপদ স্থান মনে করে ৩০/১ নং হ্যারিসন রোডে নিয়ে রাখেন। সেখানে থাকতেন অশোক নন্দী, ধরণী গুপ্ত ও নগেন্দ্র গুপ্ত। ১৯০৮ সালের ১লা মে পুলিশ হ্যারিসন রোডের ঐ বাড়ী থেকে ঐ বাক্সসহ তিনজনকেই গ্রেপ্তার করে ।

অশোক নন্দীর বয়স তখন মাত্র ১৯ বৎসর। মানিকতলা বোমার মামলা ও আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলা দুটোতেই তাকে অভিযুক্ত করা হয়। তাঁর বাসায় বাক্স ভর্তি বোমা পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বোমার মামলা টিকল না। নির্দোষ সাব্যস্ত হওয়ায় মুক্তি পান। কিন্তু তাঁকে আটকে রাখা হল পরবর্তী মামলার জন্য। সেই মামলায় অশোক নন্দীর সাত বৎসর সাজা হয়। এই মামলা চলার সময় কিশোর অশোক ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়। যেহেতু মামলার আপীলের শুনানি শুরু হতে আরও ছমাস সময় লাগবে এবং অশোকের রোগ ক্রমশঃ বেড়েই যাচ্ছে, তাই ১৯০৯ সালের ১১ই মে চিত্তরঞ্জন দাশ হাইকোর্টে তার জামীনের জন্য আপীল করেন। হাকিমকে বল্লেন যে, তাঁকে মুক্তি না দিলে মামলার শুনানী পর্য্যন্ত অশোক বেঁচে নাও থাকতে পারেন। সরকার পক্ষের উকিল জামীনে আপত্তি জানালেন এবং ধৃষ্টতার সঙ্গে বল্লেন যে, প্রেসিডেন্সি জেল-হাসপাতালে ক্ষয়রোগ ওয়ার্ডে তাকে রাখা হয়েছে, সেখানে যথেষ্ট আলো-বাতাস রয়েছে এবং রুগী খুব আরামেই আছে। উকিল আরও জানালেন, কলিকাতার সাধারণ বাড়ীর চেয়ে অনেক ভাল স্থানেই কয়েদীকে রাখা হয়েছে। স্বভাবতঃই জামীনের আবেদন অগ্রাহ্য হল।

বাংলার ধন্বন্তরি ডাঃ মহেন্দ্র নন্দী কত মুমূর্ষু রুগীকে বাঁচিয়েছেন, অথচ তার নিজের সন্তানকে বাঁচাবার সুযোগ পাচ্ছেন না। চিত্তরঞ্জন

দাশের পরামর্শে তিনি ছোট লাট বাহাদুরের কাছে আবেদন জানালেন তাঁর ছেলেকে মুক্তি দিতে অথবা আপীলের শুনানী শুরু না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কাছে রাখতে ও চিকিৎসার সুযোগ দিতে। অশোকের অবস্থার ক্রমশঃ অবনতি হচ্ছে দেখে ১৯০৯ সালের ২রা জুলাই অশোককে জামীনে মুক্তি দেওয়া হয় আর ১৯০৯ সনের ৬ই আগস্ট তিনি চিরতরে মুক্ত হয়ে গেলেন। ৭ই আগস্ট চিত্তরঞ্জন দাশ কোর্টকে জানিয়ে দিলেন যে, পূর্বরাত্রে অশোক মহামান্য কোর্টের নাগালের বাইরে চলে গেছে। পরে হাইকোর্টে রায়ে অশোকের ৭ বৎসর সাজা মকুব হয়ে যায়। অবশ্য তার আগেই তিনি চিরমুক্ত হয়ে গেছেন।

ডাঃ মহেন্দ্র নন্দীর চোখের সামনে নিঃশেষ হয়ে গেল তাঁর প্রিয় সন্তান সময়মত উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে। নীরবে সহ্য করলেন শোক, কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ, রোষ আরও বর্ধিত হল।

॥ উল্লাসকর দত্ত ॥

পূর্বেই উল্লেখ করেছি উল্লাসকরের পিতা দ্বিজদাস দত্ত প্রথম ভারতীয় যিনি ইংলণ্ডে কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করতে গিয়েছিলেন।

তিনি যখন শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কৃষি শাখার অধ্যাপক ছিলেন তখন তাঁর বাড়ীতে নিরাপদ আশ্রয়ে উল্লাসকর একটি লেবরেটরী স্থাপন করে, নানা বই পড়ে বোমা বানাবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন; তখন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। অবশ্য কলেজে পড়া তার বেশী এগোয়নি। এ সম্বন্ধে উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় "নির্বাসিতের আত্মকথায়" লিখেছেন যে, "সমস্ত নূতন ছেলে আসিয়া জুটিয়াছে উল্লাসকর তাহাদের মধ্যে একজন। প্রেসিডেন্সী কলেজের রসেল সাহেব বাঙ্গালী ছেলেদের গালি দিয়াছিল বলিয়া, উল্লাসকর একপাটী ছেঁড়া চটীজুতা বগলে পূরিয়া কলেজে লইয়া যায় এবং রসেল সাহেবের পিঠে তাহা সজোরে বখশিস দিয়া কলেজের মুখদর্শন বন্ধ করিয়া দেয়।

তাহার পর কিছুদিন বোম্বাই-এর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ঘুরিয়া আসিয়া দেশ গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাগানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।”

উল্লাসকর বোমা বানাবার চেষ্টায় কৃতকার্য হয়েছেন ঘোষণা করার পর সেই বোমা প্রয়োগ ও পরীক্ষা করার ব্যবস্থা হল। এ সম্পর্কে কালীচরণ ঘোষ 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ' গ্রন্থে লিখেছেন—“(বোমা) প্রয়োগ করার জায়গা স্থির হল দেওঘরেরই কাছে লতাগুল্ম ঢাকা অনুচ্চ দিঘিরিয়া পাহাড়। সেখানে গেলেন স্বয়ং উল্লাসকর আর সঙ্গী চারজন হলেন রংপুরের প্রফুল্ল চক্রবর্তী, বারীন্দ্র, নলিনীকান্ত গুপ্ত আর বিভূতি সরকার। পাহাড়ের মাথায় প্রকাণ্ড একটা পাথর দেখা গেল —একদিক খাড়া উঁচু, বুক প্রমাণ হবে আর একটা দিক ক্রমে ঢালু হয়ে নীচে চলে গেছে বিশ পঁচিশ হাত। প্ল্যান হল : প্রফুল্ল ছুঁড়বে খাড়া দিকটার আবডালে পিছনে দাঁড়িয়ে ঢালুটার ওপর তাক করেই, ছুঁড়ে বসে পড়বে যাতে ফাটার পর কোন টুকরা গায়ে না লাগে।” (নলিনী গুপ্ত 'স্মৃতির পাতা')।

“ঘটনা ঠিক এ রাস্তা নিল না। প্রফুল্ল বোমা ছুঁড়েছিলেন, মনে করেছিলেন বোমা ভূমিতে পড়ে ফাটবে। কিন্তু বায়ুর সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে এবং বোমার টুকরা এসে প্রফুল্লর মাথার ডান দিকটায় দারুণ আঘাত করে আর মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে। অশুভ সেদিনটা ছিল ১৯০৮ সালের জানুয়ারী ২৯-য়ে।”

এই বিপ্লবী প্রফুল্ল চক্রবর্তী বাংলা দেশের প্রথম শহীদ।

মারাত্মক ভাবে আহত হলেন উল্লাসকর দত্ত। আহত উল্লাসকরকে গোপনে কলকাতায় এনে ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের চিকিৎসায় সুস্থ করে তোলা হয়েছিল।

উল্লাসকর, বারীন্দ্র প্রভৃতির চলাফেরা পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯০৮ সালের ২রা মে মানিকতলার বাগান বাড়ীতে পুলিস হানা দেয় এবং সেখানে যে কয়টি ছেলে ছিল সকলকেই গ্রেপ্তার করে। খানা-তল্লাসী করে মাটীর নীচে থেকে বার করে কয়েকটি রাইফেল

ও বোমা। সেখানে যারা ধৃত হয়েছিল তার মধ্যে ছিলেন উল্লাসকর দত্ত, বারীন্দ্র ঘোষ, উপেন ব্যানার্জী প্রভৃতি।

"পুকুরের ঘাটের একটা প্রকাণ্ড আমগাছের তলায় আমাদের হাত বাঁধা ছেলেগুলো জোড়া জোড়া বসিয়া আছে, আর উল্লাসকর তাহাদের মধ্যে বসিয়া ইনস্পেকটার সাহেবের ওজন তিনমণ কি সাড়ে তিনমণ এই সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ বিচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।" (নির্বাসিতের আত্মকথা)

আদালতে বিচার চলার সময়ও এমনিধারা নির্বিকার ছিলেন উল্লাসকর।

"স্কুলে ছুটির পর ছেলেরা যেমন মহাস্ফূর্ত্তিতে বাড়ী ফিরিয়া আসে আমরাও সেইরূপ আদালত ভাঙ্গিবার পর গান গাহিতে গাহিতে চিৎকার করিতে করিতে গাড়ী চড়িয়া জেলে ফিরিয়া আসিতাম। তাহার পর সন্ধ্যার সময় যখন সভা বসিত তখন বার্লিসাহেব কিরকম ফিরিঙ্গি-বাঙ্গালায় সাক্ষীদের জেরা করে, নর্টন সাহেবের পেণ্টুলনটা কোথায় ছেঁড়া আর কোথায় তালি লাগান, কোর্ট ইনস্পেক্টারের গোঁফের ডগা ইঁদুরে খাইয়াছে কি আরসুলায় খাইয়াছে এই সমস্ত বিষয়ে উল্লাসকর গভীর গবেষণা করিত, আর আমরা প্রাণ ভরিয়া হাসিতাম।" (নির্বাসিতের আত্মকথা, পৃঃ ২৩)

১৯০৯ সালের ৬'মে আদালতে "ফাঁসির হুকুম শুনিয়া উল্লাসকর হাসিতে হাসিতে জেলে ফিরিয়া আসিল; বলিল,— "দায় থেকে বাঁচা গেল।"

একজন ইউরোপীয় প্রহরী তাহা দেখিয়া তাহার এক বন্ধুকে ডাকিয়া বলিলেন—"Look, look, the man is going to be hanged and he laughs!" (দেখ, লোকটার ফাঁসি হইবে তবু সে হাসিতেছে)।

তাঁহার বন্ধুটি আইরিশ; তিনি বলিলেন—"Yes, I know, they all laugh at death." (হাঁ, আমি জানি; মৃত্যু তাহাদের কাছে পরিহাসের বিষয়)। (নিঃ আঃ পৃঃ ২৮)

বারীন ও উল্লাসকরের আপীলে ফাঁসির আদেশ রদ হয়ে যায়। ১৯০৯ সালের ২৩শে নভেম্বর হাইকোর্ট রায় দেয় ফাঁসির পরিবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

বারীন উল্লাসকরদের আন্দামান জেলে পাঠান হল ১৯০৯ সালের ১১ই ডিসেম্বর 'মহারাজা' নামক জাহাজে। সমুদ্রের মধ্যে পাহাড়, পাহাড়ের উপর সেলুলার জেল। জেলের তেতলা থেকে সমুদ্র ও পাহাড়ের দৃশ্য খুবই সুন্দর দেখায়। সেলুলার জেলে সাতশো কয়েদী রাখার ব্যবস্থা ছিল। রাজনৈতিক বন্দীদের জন্যই এই জেল তৈরী হয়েছিল। এ জেলের সুবিধা হল, চারদিকে সমুদ্র, নিকটবর্তী দেশ বর্মা তিনশ মাইল দূরে। কাহারও পালাবার কোন উপায় নেই।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর এতলোকের সাজা হয়েছিল যে ভারতের জেলে রাখার স্থান ছিল না। তাই তাদের আন্দামানে রাখার জন্য এ জেল তৈরী হয়। খুবই অস্বাস্থ্যকর স্থান। একবার সেখানে গেলে দেশে ফেরবার আশা ছিল না। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক বন্দীদের সংগ্রাম ও চেষ্টার ফলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। স্বাধীন হবার পর সরকারের চেষ্টায় আন্দামান আজ মনোরম স্থানে পরিবর্তিত হয়েছে।

তখনকার আন্দামান জেল সম্পর্কে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী তাঁর "জেলে ত্রিশ বছর" বইএ লিখেছেন,—"আন্দামান জেলের খাওয়া দেশের জেল হইতে অনেক খারাপ। সস্তা রেঙ্গুন আতপ চাউলের ভাত, সারা বৎসর দুইবেলা অড়হর ডাল এবং অখাদ্য ঘাস পাতার তরকারী—ইহাই ছিল নিত্যকার খাদ্য। রাত্রে জেলে কোন আলোর ব্যবস্থা ছিল না। পায়খানার ব্যবস্থাও ছিল অদ্ভুত। রাত্রে প্রত্যেকের সেলে একটি করিয়া মাটির ঘট দেওয়া হইত। এক সেরের বেশী তাহাতে জল ধরিত না। রাত্রে কাহারও পায়খানার বেগ পাইলে প্রথমতঃ তাহাকে অন্ধকারে পা দিয়া ঘটটির অনুসন্ধান করিয়া তাহার মুখ ঠিক করিয়া পরপর মল ও মূত্র ত্যাগ করিতে হইত। মল ও মূত্র

দুইটি একসঙ্গে ত্যাগ করিবার উপায় ছিল না। একটি বন্ধ করিয়া অপরটি ত্যাগ করিতে হইবে। একসঙ্গে দুইটি ত্যাগ করিলে একটি মাটিতে পড়িবে এবং তাহাতে নিজের কোঠাই নষ্ট হইবে। কারণ ২।৩ মাস পর একদিন মলমূত্র ত্যাগের স্থানে চুণ লাগাইবে আর মলমূত্র মাটিতে পড়িলে মেথর যদি তাহা রিপোর্ট করে তবে বন্দীর সাজা হইবে।"

(জেলে ত্রিশ বছর, পৃঃ ৬৮)

আন্দামান জেলে খাওয়ার পরিমান যেমন ছিল কম, দুর্ব্যবহার ছিল তেমন বেশী। পান থেকে চুণ খসলেই কিল চড় লাথি, গলাধাক্কা, ডাণ্ডাবেড়ী সবই চলত। অত্যাচারের মাত্রা কত নিষ্ঠুর ও সীমাহীন এবং অত্যাচার কিভাবে উল্লাসকরের মনকে বিধ্বস্ত করেছিল তাহা তাঁহার বর্ণিত "কারাকাহিনী"তে সুস্পষ্টভাবে লিখে রেখে গেছেন—

—"নারিকেল ও তিল হইতে তেল নিষ্কাসনের জন্য ভারতে যে ভাবে ঘানীর সহিত বলদ জোতা হয়, আমাকেও সেইভাবে তৈল নিষ্কাসনের যন্ত্রের সহিত জোয়াল দিয়া জোতা হইয়াছিল। ভারতে ঘানি ব্যবহার করার জন্য বলদ ব্যবহার করা হয় এবং তাহারাও সরিষা হইতে দিনে ষোল পাউণ্ডের অধিক তৈল বাহির করিতে পারে না। আন্দামানের জেলে চাকা ঘুরাইবার হাতলের সহিত মানুষকে জোয়াল দিয়া জোতা হইত এবং দৈনিক আশী পাউণ্ড নারিকেল তৈল নিষ্কাসনের কঠিন কর্ম তাহাদের উপর চাপান হইত। একটি যন্ত্রের হাতলের সহিত তিনজন করিয়া বন্দীকে জোয়াল দিয়া জোতা হইত এবং স্নান ও মধ্যাহ্ন আহারের জন্য ক্ষণিক বিরতি ব্যতীত সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহাদের অবিরত কাজ করিতে হইত। প্রকৃতপক্ষে যে বিরতি আমাদের দেওয়া হইত তাহা কয়েক মিনিটের অধিক ছিল না। জন্তু ধীর গতিতে ঘানীর চারিদিকে পরিক্রমা করিতে পারে কিন্তু আমাদের দৌড়াইতে হইত। আমাদের মনে ভয় ছিল যে তাহা না করিলে আমরা দৈনিক বরাদ্দ অনুযায়ী তেল বাহির করিতে পারিব না। যদি আমাদের মধ্যে কেহ তাহার গতি মন্থর করিতেন তাহা

হইলে জমাদার তাহাকে তাহার হস্তধৃত বৃহৎ লাঠি দিয়া প্রহার করিত। ঐ যষ্ঠ্যাঘাতেও তাহার গতি দ্রুততর না হইলে তাহাকে তাহা বাধ্য করিবার জন্য অন্য একটি পদ্ধতিও ছিল। তাহার হাত পা ঐ ঘুরন্ত চাকার হাতলের সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হইত এবং অন্যদের দ্রুতবেগে দৌড়াইবার আদেশ দেওয়া হইত। তখন ঐ হতভাগ্য ব্যক্তির রথ চক্রে বাঁধা মানুষকে ভূমিতে হেঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া যাইবার মতই অবস্থা ঘটিত। তাঁহার সর্বাঙ্গ ছড়িয়া এবং রক্তপাত আরম্ভ হইত। তাঁহার মাথা মেজে ঠোকা খাইতে খাইতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইত। এইভাবে কাজ করাইবার ফলে কি অবস্থা ঘটিত আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। মানুষ মানুষের কি অবস্থা করিতে পারে? এই পদ্ধতি ও তাহা দ্বারা সৃষ্ঠ অত্যাচার দেখিয়া কবির এই বাণী আমার ওষ্ঠ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিত। এই কাজ করিবার পর সন্ধ্যাবেলা কুঠরিতে ফিরিয়া আসিয়া আমি সম্পূর্ণরূপে অবসন্ন হইয়া পড়িতাম। পুনরায় এই নিদারুণ বেদনাদায়ক কাজ করিবার জন্য আমি সকাল পর্যন্ত জীবিত থাকিব বলিয়া আমার অন্তরে নিশ্চয়তা ছিল না। তথাপি আমি জীবিতই থাকিতাম ও সারাদিন ঠিকমতই কাজ করিতাম। আমরা সকলেই বলাবলি করিতাম ঐ কাজ করাই আমাদের অদৃষ্টে লেখা আছে এবং আমাদের মূল্য দিতে হইবে। অন্য যে সকল কয়েদীরা আমাদের সঙ্গে কাজ করিত ছয় মাস বাদেই তাহাদের এই কাজ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত ও বাহিরের কাজে পাঠান হইত। অন্যদল তাহাদের স্থলে কাজ করিতে আসিত এবং নির্দিষ্ট কালের পরেই তাহাদের পূর্ববর্তীদের মত বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। কিন্তু আমি ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীরা এই একই গুরুশ্রমজনক কার্যে নিযুক্ত থাকিতাম। বছরের পর বছর বিরামহীনভাবে এই পরিবর্তনহীন কাজ চলিয়াছিল। অবশেষে একদিন আমিও বাহিরে যাইবার আদেশ পাইলাম। কিন্তু এই পরিবর্তন তপ্ত কড়াই হইতে অগ্নিতে নিক্ষেপ ছাড়া অন্য

কিছুই ছিল না। কারণ আমাকে একটি জেলায় অবস্থিত ইট তৈয়ারীর কারখানায় পাঠান হইয়াছিল। আমাকে সারাদিন না পোড়ান ভিজা ইট বহন করিয়া এধার ওধার ছুটাছুটি করিতে হইত। সাধারণ মানুষের পক্ষেও এই কাজ ছিল সবিশেষ ক্লান্তিকর। সেইজন্য তাহাকে উৎসাহ দিবার জন্য কিছু পরিমাণ দুধ দেওয়া হইত। কিন্তু এই দুধ পান করিবার পূর্বেই উপস্থিত খুদে অফিসার অথবা টিণ্ডেল তাহার হাত হইতে পাত্রটি কাড়িয়া লইয়া ঐ দুধ নিজের গলায় ঢালিয়া দিত। আমিও আমার অংশমত দুধ পাইতাম এবং কোনদিকে না তাকাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পান করিয়া ফেলিতাম। কয়েকদিন পরেই তাহাকে ঐ নৈবেদ্য উৎসর্গ না করায় টিণ্ডেল আমার উপর অত্যধিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সে আমার কাজ পরিবর্তন করিয়া এমন কাজ দিল যেখানে শ্রমিকদের জন্য দুধের বরাদ্দ নাই। পরে সে আমাকে বসতির সর্বাধিক শ্রমজনক কাজ দিয়াছিল। আমাকে খাড়া পথ ধরিয়া উপরে উঠিতে হইত এবং কূয়া হইতে দুই বালতি জল তুলিয়া বালতি দুইটি একটি দণ্ডের দুই দিকে বাঁধিয়া কাঁধে বহন করিয়া একজন অফিসারের গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে হইত, বালতি ও জল মিলিয়া ওজন দাঁড়াইত একমণের কাছাকাছি। পাহাড়ে উঠিবার পথও ছিল অত্যন্ত খাড়া এবং প্রতিমুহূর্তে আমার পা পিছলাইয়া নীচের উপত্যকায় পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিত। এই খাড়া পথ ধরিয়া উঠা নামার কাজ আমাকে সারাদিন করিতে হইত। দিনের শেষে আমি ক্লান্তিতে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতাম। আমি অনেকদিন ধরিয়া এই কাজ করিয়াছিলাম। অবশেষে এই কাজের প্রতি আমার নিরতিশয় বিরক্তি জন্মিল ও আমি আর তাহা করিতে অসম্মতি জানাইলাম। আমার বিরুদ্ধে অবাধ্যতা ও কাজ ফাঁকি দিবার অভিযোগ আনা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে কিছুদিন হাসপাতালে বিশ্রাম করিয়া পুনরায় এই কাজ আরম্ভ করিতে রাজী করাইবার জন্য তাঁহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু আমি মনস্থির করিয়া

ফেলিয়াছিলাম। আমরা রাজনৈতিক বন্দীরা জেলের ও বসতির নিয়ম বা বিধি অনুযায়ী সকল কার্য করিয়া থাকি কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের সম্পর্কে কোন রকম সুবিবেচনার পরিচয় দেন না। তবে আমরাই বা কেন তাহাদের ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য নত হইব? আমরা যতই পরিশ্রম করি তাহারা ততই আরও বেশী শ্রম করাইতে চান। আমাদের শরীর লইয়া তাহারা যাহা ইচ্ছা করুন কিন্তু আমাদের মন আমরা অন্ততঃ স্বাধীন রাখিব। তাঁহারা আমার দেহকে শাসন করিতে পারেন কিন্তু আমার অন্তরে প্রভু আমিই। আমি নিজ হইতে আমাকে তাহাদের দাসে পরিণত করিব না। আমাকে তিন মাসের জন্য অতিরিক্ত কাজের পরিশ্রম করিবার দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল এবং কুঠরিতে তালা বন্ধ করিয়া রাখিবার জন্য আমাকে ফেরৎ পাঠান হইয়াছিল।

সেই বন্দীশালার ফটকের নিকট সেই মিঃ ব্যারী আমাকে দেখিবামাত্র গর্জন করিয়া উঠিয়াছিলেন—"ইহা খেলার মাঠ নয়, মনে রাখিবে ইহা জেলখানা। তুমি যদি নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ কর তাহা হইলে আমি তোমাকে বেত দিয়া পিটাইব। আমি ত্রিশ ঘা বেত লাগাইব এবং ইহার প্রত্যেকটিই তোমার মাংস কাটিয়া বসিবে।"

আমি উত্তর দিয়াছিলাম—"তুমি আমার দেহকে টুকরো টুকরো করিতে পার কিন্তু আমি এখানে আর কোন কাজই করিব না। কারণ আমি মনে করি যে তোমার আদেশ অনুযায়ী কাজ করা আমার বিবেকের বিরুদ্ধে অপরাধ করারই সামিল।"

সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ ব্যারি আদেশ দিলেন যে আমার হস্তদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইবে এবং ঐ শৃঙ্খলের সাহায্যে আমাকে এক সপ্তাহের জন্য আমার কুঠরির মধ্যে উপর হইতে ঝুলাইয়া রাখা হইবে।

১০৭ ডিগ্রী জ্বর লইয়া শৃঙ্খল দিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে মস্তিষ্ক বিকৃতি ছাড়া আর কি ঘটিতে পারে?

মানসিক অর্ধচৈতন্য অবস্থা ও দৈহিক তীব্র যন্ত্রণার মধ্যেও আমি

সুস্পষ্টভাবেই অনুভব করিতে পারিতেছিলাম যে মেডিকেল সুপারিণ্টডেণ্ট আমার উপর তাহার ইলেকট্রিক ব্যাটারী প্রয়োগ করিয়াছিল। এই শক্ সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। বিদ্যুৎ চমকের মতই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ আমার সর্বাঙ্গে প্রবাহিত হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল আমার দেহে শয়তান আশ্রয় লইয়াছে। যে সকল শব্দ আমার ওষ্ঠাধর হইতে বাহির হইয়াছিল তাহা আমি পূর্বে কোন দিন উচ্চারণ করি নাই। আমি এমনভাবে আর্তনাদ করিয়াছিলাম যাহা জীবনে কোনদিন করি নাই। তারপর হঠাৎ অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। তিনদিন আমি দিবারাত্র অজ্ঞান হইয়া ছিলাম। আমার জ্ঞান সঞ্চারের পর আমার বন্ধুরা ইহা আমাকে বলিয়াছিল।"

উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধায় 'নির্বাসিতের আত্মকথায়' লিখেছেন—"প্রাতঃকালে দেখা গেল যে জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু উল্লাসকর আর সে উল্লাসকর নাই। আসন্ন বিপদের মধ্যেও যিনি চিরদিন নির্বিকার, তীব্র যন্ত্রনায় যাহার মুখ হইতে কখনও হাসির রেখা মুছে নাই। তিনি উন্মাদগ্রস্ত।" (পৃ-৪২)

সাভারকার উল্লাসকর সম্পর্কে লিখেছেন—"উল্লাসকর মাণিকতলা বোমার মামলায় ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছিলেন। যে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে দণ্ড দিয়াছিলেন তিনিও নিম্নোক্ত ভাষায় তাহার প্রশংসা করিয়াছেন—আমি জীবনে যত বালককে দেখিয়াছি তাহার মধ্যে উল্লাসকর শ্রেষ্ঠ কয়জনের অন্যতম, তবে সে আদর্শের প্রতি অধিক অনুরক্ত।

১৯৬৫ সালের মে মাসে বিপ্লবী উল্লাসকর পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি শিলচরে বাস করছিলেন। শিলচর বাসীর অকৃত্রিম সাহায্য লাভ করেছিলেন। শিলচর সহরে তাঁর নামে একটি রাস্তার নামকরণ হয়েছে। তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য কলকাতায় কিছুই করা হয়নি। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

॥ বিপ্লবীর সান্নিধ্য ॥

আমাদের সাতমহল্লা বাড়ীর ভগ্নাবশেষে একটি পরিত্যক্ত নাট মন্দির ছিল, তাকে ঢেকে রেখেছিল ঘনজঙ্গল। ঐ মন্দির থেকে এক রাত্রে বের হয়ে এসেছিলেন দেবী ছিন্নমস্তা এবং তাকে দেখে আমার এক প্রপিতামহী চিরতরে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। তাছাড়া ওখান থেকে মাঝে মাঝে নিশীথরাত্রে উলু-ধ্বনি, ঘণ্টার শব্দ ও ধূপের গন্ধ নাকি ভেসে আসত। তারই জন্য ঐ স্থানটি ছিল একটি নিষিদ্ধ এলাকা।

আমি যখন ছোট, বয়স বছর দশ, তখন আমার ঐ নিষিদ্ধ স্থানটি দেখার খুব কৌতূহল হয়। অবশেষে একদিন আমার ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকেই পড়লাম সেই মন্দিরে। অবশ্য ভয়ে গা ছমছম করছিল। তবু মুখে বড় বড় কথা বলে নানারকম শব্দ করে ছোট ভাইকে সাহস দিলাম। মন্দিরের মাঝখানে একটা বড় কোঠা বেশ পরিষ্কার ও অক্ষত ছিল। একটি সাপ ছাড়া আর কিছু ওখানে দেখলাম না। আর একটা ছোট কোঠাতে দেখতে পেলাম একটি বাক্স যত্ন করে রাখা হয়েছে। এ যে দেবতার ধনরত্নের ভাণ্ডার এবিষয়ে আমার সন্দেহ রইল না। এটা তুলতে যাব, মনে হল যদি বাক্সের মধ্যে ভূত বা অপদেবতা থাকে তাহলে দেহটি ত আস্ত থাকবে না। যাহোক, মন থেকে ভয় দূর করে তুলেই নিলাম বাক্সটি এবং দৌড়ে এনে বাবার হাতে দিলাম। আমরা ঐ মন্দিরে ঢুকেছিলাম শুনে বাবা প্রথমে খুব বকুনি দিলেন। পরে বাক্সটি খুলে গম্ভীর হয়ে গেলেন। বাক্সটিকে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন প্রমথ নন্দীর বাড়ীতে। প্রমথ নন্দী সে সময় গৃহে অন্তরীণ, পুলিশ তার গতিবিধি অনুসরণ করে। তিনিও নিয়মিত থানায় হাজিরা দেন। কিছুদিন যাবৎ বাড়ীতে নজরবন্দী রয়েছেন। প্রমথবাবু বাক্সের জিনিষগুলো দেখে বল্লেন, "এ সব তাজা কার্তুজ গ্রামের বিপ্লবীদের সম্পত্তি। পুলিশ দেখতে পেলে জেলে নিয়ে যাবে।" তাঁর নির্দেশমত

আমি ও বাবা সোজা চলে গেলাম একটা অব্যবহৃত দীঘির কাছে। সেখানে সেটা ডুবিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরলাম। পরে জানা গেল আমার দাদা অমূল্য নন্দী বাক্সটি ওখানে রেখেছিলেন এবং অপদেবতার মন্দিরটি স্থানীয় বিপ্লবীরা গোপন কাজের জন্য ব্যবহার করতেন। বুঝলাম বিপ্লবীদের অপদেবতার ভয় নেই। সেদিন থেকেই বিপ্লবীরা আমার কাছে রহস্যময় ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে উঠলেন। তাঁদের সম্বন্ধে মনে যেন এক ভয়-ভক্তি মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পরবর্তী কালে আমাদের ঐ মন্দির ভেঙ্গে তার ইট দিয়ে নির্মিত হয়েছিল মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পিতামাতার সমাধির উপরের মন্দির। ফলে অপদেবতাদের আশ্রয় স্থলটি ধ্বংস হয়ে যায়। একটা মস্ত বড় ভয়ের কেন্দ্রের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে গেল।

১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে গিয়েছিলাম জন্মভূমি, জন্মস্থান দেখতে, কিন্তু চিনতে পারি নি নিজের বাড়ীটিকে। সাতমহল্লা বাড়ী আজ ধান-ক্ষেতে পরিণত হয়েছে। মাত্র একপাশে একটা বেল গাছ দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে তারই নীচে আমার মা ও বাবা চিরতরে শায়িত আছেন! যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলাম তার এই ফল— চোখে জল এসে গেল। একটুকরো মাটি কুড়িয়ে নিয়ে চলে এলাম। গ্রামটির বর্ধিষ্ণুতা রুদ্ধ হয়ে গেছে। আমাদের পাড়া ও দত্ত পাড়া যেন শ্মশানে পরিণত হয়েছে। উল্লাসকরের বাড়ীর অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। মহেন্দ্র নন্দীর সেই বিখ্যাত মন্দির ভেঙ্গে গেছে, শুধু দেয়াল কখানা মন্দিরের পরিচয় বহন করে রেখেছে। রামদুলাল নন্দী যে বাড়ীটি গুরুকে দান করেছিলেন তাতে বাস করছে এক অনধিকারী মুসলমান পরিবার। এই স্বাধীনতার জন্যই কি গ্রামের তরুণরা সংগ্রাম করেছিল?

১৯২০ সালের ৩রা জুন মাদ্রাজ জেল হতে উল্লাসকর মুক্তি পেলেন।

কিছুদিন পর এলেন স্বগ্রাম কালীকচ্ছে, নিজ বাড়ীতে। বোমাবিশারদের কীর্ত্তিকলাপ পূর্বেই শুনেছিলাম। আমাদের কাছে তিনি ছিলেন রূপকথার নায়ক। একদিন খবর পেলাম উল্লাসকর তার মামা ডাঃ মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বাড়ী আসছেন সকলের সঙ্গে দেখা করতে।

মহেন্দ্র নন্দীর বাড়ীর পুরনো নাটমন্দিরে তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য কিছুলোক অপেক্ষা করছিল। আমিও কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে হাজির হলাম বিপ্লবী-বীরকে দেখার জন্য। শুনেছিলাম তার মাথার একটি শিরা কেটে ওষুধ দিয়ে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়েছিল। সুতরাং উল্লাসকরের দিকে চেয়ে প্রথমেই তার মাথায় কোন দাগ আছে কিনা লক্ষ্য করলাম। একটা দাগ সত্যি ছিল। কিন্তু সেটা কিসের দাগ জিজ্ঞেস করতে সাহস হয়নি কখনও।

উল্লাসকরের সামনে একটা হারমনিয়ম ছিল, তিনি দু'একটা গান করলেন। পরে একবার নাক দিয়ে হারমনিয়মে সা রে গা মা বাজিয়ে আমাদের সকলকেই খুব চমকে দিলেন। পরিচিত লোকদের সাথে কথা বল্লেন, ঠাট্টাও করলেন কিন্তু সে নেহাৎ মামুলি ব্যাপার। জেলের কথা, আন্দামানের কথা, বিশেষত বোমার কথা কিছুই বল্লেন না। তাই আমি একটু নিরাশ হলাম। কিশোর মনের গল্প শোনার আগ্রহ তিনি চরিতার্থ করলেন না দেখে দুঃখও হল। অবশ্য তিনি আমাদের যে কোন সময় তার বাড়ীতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আজ আর মনে নেই বোমার কথা শোনার জন্য তার কাছে গিয়েছিলাম কিনা। তবে মনে আছে তার সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার আমাদের প্রাণে এক নূতন প্রেরণা এনে দিয়েছিল, বিপ্লবী হবার একটা আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল মনে।

॥ অসহযোগ আন্দোলন ॥

১৯২১ সালে শুরু হল মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন। জানুয়ারী মাসে চিত্তরঞ্জন দাস আইন ব্যবসা বর্জন করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ২১শে মার্চ কংগ্রেসের প্রচারকার্যে

কুমিল্লা এলেন। তখন তার উদ্যোগে ত্রিপুরা কংগ্রেসকমিটি গঠন করা হয়। কংগ্রেস থেকে সারা জেলায় প্রচারের জন্য গ্রামে গ্রামে নেতাদের পাঠান হয়। অনেক ছাত্র, অনেক উকিল আদালত বর্জন করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। কুমিল্লা থেকে প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা যোগেশ চ্যাটার্জী ও উকিল হলধরবাবু কালীকচ্ছে এলেন কালীকচ্ছকে কেন্দ্র করে গ্রামে গ্রামে অসহযোগ আন্দোলনের প্রসার ও কংগ্রেসের প্রচারের জন্য।

মহেন্দ্র নন্দীর বাড়ীতে একটি জাতীয় স্কুল প্রতিষ্টিত হল। একটি কারখানা ও প্রতিষ্ঠিত হল তাতে ঝিনুকের বোতাম, নারকেল মালার বোতাম, দেশলাই তৈরীর কল, কাপড় তৈরীর উন্নত ধরনের তাঁত ইত্যাদি সবই তখন পুরো উদ্যমে তৈরী হতে লাগল। দেশ-বিদেশ থেকে লোক আসত এসব কাজ শেখার জন্য। নেতারাও আসতেন এই কর্মকেন্দ্র দেখার জন্য। এসময় বিপিনচন্দ্র পালও এসেছিলেন।

আমার বয়স তখন বছর তেরো, কৈশোরের স্বপ্নভরা দিনগুলোর মাঝে সবচেয়ে বড় স্বপ্ন হয়ে দাঁড়াল স্বরাজের স্বপ্ন। চারধারে যে সভা সমিতি শোভাযাত্রা স্বদেশী-গান ও হরতালের জোয়ার বইল আমি তাতে মহা আনন্দে যোগ দিলাম, স্কুলে যাওয়া বন্ধ করলাম। যখন গান্ধীজীর ডাকে উকিল ব্যারিষ্টার কোর্টে যাওয়া বন্ধ করেছে, সরকারী চাকুরে অনেকে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছাত্ররা স্কুল বর্জন করেছে তখন এই গ্রামের আমরাই বা বাদ যাই কেন? গান্ধীজী বলেই দিয়েছেন এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আসবে। তখন একটা বছর না হয় পড়াশোনা নাই হল। মোড়ের মাথায় স্বরাজের রথের চূড়ো নাকি দেখা যাচ্ছে তাই এবার রথের রসিতে কসে এক টান মেরে জনম সার্থক করি। তারপর রথ যাত্রার এই উৎসব শেষ হলে আবার না হয় পুঁথিপত্তরের ধূলি ঝেড়ে নতুন করে পাঠ শুরু করব। এমনিধারা এক মনোভাব তখন আমাদের।

আমাদের গ্রামের সংলগ্ন সরাইলে ছিল থানা, রেজিষ্ট্রী-অফিস,

জমিদার কমলারঞ্জনের কাছারি বাড়ী। আর ছিল মুসলিম জমিদার দেওয়ান মুস্তফ আলির বাড়ী। এই মুস্তফ আলি ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম দিকে কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় বিপিনচন্দ্র পালের সভার সভাপতি হয়েছিলেন। কিছুদিন পর কূটবুদ্ধি সম্পন্ন লর্ড কার্জনের প্ররোচনায় ঢাকার নবাব যখন কুমিল্লায় এসে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিলেন তখন মুস্তফ আলি সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হয়ে যান। কিন্তু তার ছোট ভাই উবেদুল্লা আজীবন কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

সে যুগে দৈনিক পত্রিকার এত প্রচলন হয়নি। আমাদের গ্রামে কোন দৈনিক সংবাদপত্র আসত না। সাপ্তাহিক হিতবাদী এবং সঞ্জীবনী তখনকার দিনে জনপ্রিয় ছিল। আমাদের গ্রামে এই দুটো কাগজ আসত। আমরা ঐগুলি পড়ে আন্দোলন সম্বন্ধে অবহিত হতাম, তার গতিধারা অনুসরণ করতাম। গান্ধীজীকে অনুসরণ করা, তাঁকেই আদর্শ করে চলা আমাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল।

গান্ধীজী সপ্তাহে একদিন মৌন থাকেন, সুতরাং আমরাও একদিন মৌন থাকব ঠিক করলাম। বেশ মজাই লাগত মৌন থেকে দিনটা কাটাতে, কিন্তু গোল বাঁধল একদিন। সেদিন আমি মৌনী, আমার বাবা বাড়ী নেই, হঠাৎ বাড়ীতে এসে হাজির হলেন আমার দিদির বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে পাত্রপক্ষের লোকজন। বাড়ীতে আমি ছাড়া পুরুষ কেউ নেই, তাই আমাকেই তাদের কাছে যেতে হল। তারা যা জিজ্ঞেস করেন আমি লিখে জানাই। পাত্র পক্ষ দু-চার কথা জিজ্ঞেস করে সরে পড়লেন। বাবার ফেরার অপেক্ষা করার জন্য আমার লিখিত অনুরোধ উপেক্ষা করলেন। পরে জানা গেল বোবা ছেলের বোন বোবা হতে পারে সন্দেহ করে তারা পালিয়ে গিয়েছিলেন।

এই ঘটনার পর যথারীতি মা-বাবার বকুনি খেতে হল। তার

ফলে আমারও মৌন ব্রত পালনের উৎসাহ বেশী দিন আর স্থায়ী হল না।

॥ দরিদ্র ভাণ্ডার ॥

গান্ধীজীর আন্দোলন ব্যর্থ হল। চৌরীচোরার ঘটনার পর গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। প্রত্যাশিত স্বরাজ এল না। উকিল মোক্তার আবার কোর্টে যেতে আরম্ভ করল। মাষ্টার ছাত্র কলেজ ও স্কুলে ফিরে গেল। আমাদেরও আবার স্কুল, সকাল সন্ধ্যায় পড়া, দুপুরে হেডপণ্ডিত কালীমোহন অধিকারীর বেতটির দর্শন, হেডমাষ্টার হরকুমার বণিকের সদুপদেশ শুরু হয়ে গেল। তবে এখন আমরা শুধু স্কুলের পড়াতেই নিবিষ্ট না থেকে দেশের কাজ করার জন্য উপযুক্ত হবার প্রতিজ্ঞা নিলাম। পাড়ার ছেলেরা মিলে একটা সংস্থা গঠন করলাম, নাম দিলাম 'দরিদ্র ভাণ্ডার'। সুরেন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয় সভাপতি, আমি সম্পাদক। দরিদ্র ভাণ্ডারের অর্থ সংগ্রহের জন্য 'মুষ্টি ভিক্ষা' প্রচলন করা হল। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে একটি করে মাটির হাঁড়ি দিয়ে এলাম এবং অনুরোধ জানালাম রোজ ভাতের জন্য চাল নেবার সময় এক মুঠো চাল যেন এই হাঁড়িতে রাখেন। সেই হাঁড়ির চাল আমরা প্রতি রবিবার তুলে নিয়ে আসতাম। এই চাল বিক্রি করে টাকা যা পেতাম, তা প্রেসিডেন্ট সুরেন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয়ের কাছে রাখা হত। আমাদের আত্মীয়রা, যাঁরা কলিকাতায় থেকে চাকরি করেন, তাঁদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্যও পেতাম। টাকা কিছু সংগ্রহ হওয়ার পরই আমরা দরিদ্র ভাণ্ডারের পরিচালনায় একটি লাইব্রেরী স্থাপন করলাম। কিছু বই কিনলাম, কিছু সংগ্রহও করলাম। সাধারণতঃ আমরা ধর্মগ্রন্থ, স্বামী বিবেকানন্দের বই দেশাত্মবোধক বই, বিখ্যাত লোকের গ্রন্থাবলী, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি লাইব্রেরীতে রাখতাম। ডিটেকটিভ বই বা উপন্যাস না রাখাই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। 'নীলবসনা সুন্দরী' নামে একটি প্রসিদ্ধ ডিটেকটিভ

উপন্যাস একজন দান করেছিলেন। আমরা তা প্রত্যাখ্যান করায় তিনি আমাদের উপর খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন আজও মনে পড়ে।

বই পড়া ও পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য ভাল করার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করার ব্যবস্থা করা হল। দীনেশ নন্দী, চিত্তরঞ্জন নন্দী, বিষ্ণুদাস নন্দী, কানু ভট্টাচার্য, অমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, সুবোধ ভট্টাচার্য প্রভৃতি পাড়ার ছেলেদের নিয়ে রোজ বিকেলে ব্যায়াম করতে লাগলাম। আরও ঠিক হলো যে প্রতিদিন আমরা সকালে গীতা পাঠ করব এবং রাত্রে শোবার আগে ডায়েরী লিখব।

পাড়ার গরীব লোকদের বিপদে আপদে সাহায্য করার জন্য দরিদ্র ভাণ্ডারের অর্থ ব্যয় করা হত। তাছাড়া রুগীর সেবা শুশ্রূষা করার জন্যও আমরা সচেষ্ট হলাম। রাত্রে রুগীর শুশ্রূষা করার আহ্বান আসত অনেক বাড়ী থেকেই। বিশেষ ভাবে আজ মনে পড়ে দীপচাঁদের কথা। দীপচাঁদ থাকত আমাদের পাড়ায়। তার জীবিকার একমাত্র সম্বল ছিল একটি কুড়াল, বড় বড় গাছ অনায়াসে কেটে ফেলত সে। পশ্চিম থেকে কি করে এসে সে বাস করতে লাগল আমাদের গ্রামে, আত্মীয়-স্বজনবিহীন একাকী, সেটা ছোট বেলায় খোঁজ করিনি। তার মুখে হিন্দী-বাংলা শুনে আমরা বেশ আনন্দ পেতাম। সবল স্বাস্থ্যবান দীপচাঁদকে কদিন পথে দেখতে না পেয়ে তার বাড়ী গিয়ে দেখলাম সে বিছানায় শুয়ে রয়েছে। সারাগায়ে ঘা এবং জ্বরে আক্রান্ত। নড়তে চড়তেও পারছে না। আমরা লেগে গেলাম তার শুশ্রূষায়। ঘা বেড়ে গেল, দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। বিরাট দেহটাকে নড়াতে কষ্ট হয় তবু আমরা যথাসাধ্য সেবা-শুশ্রূষা করলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচাতে পারিনি।

॥ প্যারীনাথ নন্দী ॥

একবার হঠাৎ পাড়ায় চোরের উপদ্রব বেড়ে গেল। প্যারীনাথ নন্দীর পরামর্শে আমরা এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করলাম।

রোজ গভীর রাতে পাহারা দিবার প্ল্যান হল। বিভিন্ন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পাড়া পরিভ্রমণ করে বাড়ীর লোকদের জাগিয়ে দিতাম—"বস্তিওয়ালা জাগো"।

প্যারীনাথ নন্দী শুধু পরামর্শই দেননি নিজেও আমাদের সঙ্গে রাত্রে পাহারায় যোগ দিতেন। সব জনকল্যাণমূলক কাজে তাঁর সাহায্য পাওয়া যেত। দুঃস্থ রুগীকে অর্থ দিয়ে এবং ঔষধ দিয়ে সাহায্য করতেন। তিনিও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতেন, পয়সা নিতেন না কাহারও কাছ থেকে। তাঁর পিতা খ্যাতনামা পুলিশ ইনস্পেকটার কালীনাথ নন্দী এবং সেজন্যই ঐ বাড়ীকে বলা হত 'দারোগা বাড়ী'।

প্যারীনাথ নন্দী ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নেন এবং অনুমান ১২৭৩ সালে এক বাল বিধবা বিনোদিনীকে বিয়ে করে গ্রামে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিলেন। বিনোদিনী নন্দী কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর আত্মীয়া। শিক্ষিতা কলকাতার মেয়ের বেশভূষা কথাবার্ত্তা গ্রামের লোকদের কৌতূহলের ও সমালোচনার বিষয় ছিল। প্যারীবাবু পরোপকারী গোঁড়া, সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় কালীকচ্ছে একটি ব্রহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শহর ছাড়া অন্য কোন গ্রামে ব্রহ্ম মন্দির স্থাপিত হয়নি কোথাও। তাঁরই পুত্র প্রমথনাথ নন্দীকে বসন্ত চ্যাটার্জী হত্যার মামলায় পুলিশ গ্রেপ্তার করে বহুদিন জেলে আটক রেখেছিল।

আমাদের এই কাজগুলো এতদিন আমাদের পাড়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯২৫ সালে সারাগ্রামে একটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য সমবেত চেষ্টা হল। প্রতিষ্ঠানটির নাম হবে কালীকচ্ছ পল্লীমঙ্গল সমিতি। সকল পাড়ার লাইব্রেরী ও ব্যয়ামাগার এরই অধীনে চলবে। সমিতির সম্পাদক নির্বাচন প্রশ্নে মতানৈক্য দেখা দিল। এক পক্ষের মনোনীত আমি অন্য পক্ষের মনোনয়ন পেল সদ্য পাশ করা গ্র্যাজুয়েট একজন। নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে একটু উত্তেজনাও দেখা দিল। নির্দিষ্ট দিনে মাইনর স্কুল-ঘরে সভা বসল, ভোটে আমি নির্বাচিত হয়ে গেলাম সহজেই।

এই ঘটনার সময় আমাদের গ্রামে উপস্থিত ছিলেন 'ত্রিপুরা হিতৈষী' পত্রিকার সম্পাদিকা উর্মিলা সিংহ। একটা গ্রাম্য নির্বাচনে এত উৎসাহ ও উত্তেজনা তাকে খুবই মুগ্ধ করল। কুমিল্লা ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর কাগজে এই নির্বাচনের রিপোর্ট বের করলেন। Class X এর ছাত্র আমি। একটা কাগজে ছাপার অক্ষরে নাম প্রকাশিত হয়ে গেছে দেখে কি খুশীই না হয়েছিলাম!

ইতিমধ্যে উল্লাসকর দত্তের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে নানা কথা হয়, কিন্তু কখনও তাঁর আন্দামান কারাজীবন বা বোমার কাহিনী সম্পর্কে কিছু বলেন না। পরবর্তীকালেও তাঁর এই অধ্যায়টা আমাদের কাছে গোপনই রেখেছিলেন। আমরা মহাত্মাজীর আন্দোলনে মেতে উঠেছি দেখে তিনি হাসতে হাসতে বলতেন—বৈষ্ণব মতে দেশ স্বাধীন হয় না।

একদিন আমরা গ্রামের ছেলেরা একটা পুকুরের কচুরিপানা পরিষ্কার করছি। তা দেখে বল্লেন—ইংরেজ রইল হাজার হাজার মাইল দূরে আর তোমরা এখানে কচুরী পানা সাফ করে দেশোদ্ধার করবে ভাব?

অতীত সম্পর্কে তিনি নীরব থাকলেও বিপ্লবীদের খুব ভাল বাসতেন, স্নেহ করতেন।

মাঝে মাঝে মাথায় একটা যন্ত্রনা অনুভব করতেন, তাই একসঙ্গে বেশী সময় কথা বলতে বা কাজ করতে পারতেন না। তবু নানা রকম কাজ করার একটা নেশা ছিল। রান্না করার জন্য অনেক পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে একটা ষ্টোভ তৈরি করেছিলেন। সেটা এখকার জনতা ষ্টোভের মত, তবে সাদা আলোটা আসত না। কিছুদিন পর দেখলাম বাঁশ, চট ও আলকাতরা দিয়ে একটি ছোট নৌকো তৈরী করে ফেলেছেন। বেশ বেড়ানো যেত সেই নৌকো চড়ে। নিজে বাঁশের বাঁশী তৈরী করে নিজেই বাজাতেন।

॥ বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥

উল্লাসকর দত্তের বাড়ীতে আমার পরিচয় হ'ল বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে।

বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্কুল বর্জন করে এসে ভর্তি হলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জাতীয় বিদ্যালয়ে ১৯২১ সালে। ১৯২৪ সালে গৌড়ীয় সর্ব বিদ্যায়তনের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করে কালীকচ্ছ গেলেন টোলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য। আমাদের পাড়ায় সুরেন্দ্রচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয়ের বাড়ীতে থেকে টোলে পড়ছিলেন। অবশ্য শাস্ত্র পড়ার চেয়ে রাজনীতি ছিল বোধ হয় মুখ্য উদ্দেশ্য।

১৯২৪ সালের জুন মাসের ১৯ বা ২০ তারিখে একদিন উল্লাসকর দত্তের বাড়ী গিয়ে দেখলাম বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের হাতে একটি খবরের কাগজ, চোখে জল। জিজ্ঞেস করে জানলাম যে ১৬ই জুন চিত্তরঞ্জন দাশ দেহত্যাগ করেছেন। দেশের একজন নেতার জন্য তাঁর এত দরদ দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হলাম। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী আমরা একটি শোক মিছিল বার করে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করলাম এবং পরে একটি সভা করে শোক প্রস্তাব নিলাম।

এই ঘটনার পর বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে প্রায়ই দেশের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হত। তিনি আমাকে বিপ্লবীদের কথা বল্লেন, কয়েকটি নিষিদ্ধ বইও পড়তে দিলেন। কিছুদিন পরে জানালেন তিনি একটি বিপ্লবী দলের সভ্য এবং তাঁর দলের নেতা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ললিতমোহন বর্মন। তিনি আরও জানালেন ইচ্ছা করলে আমি ললিতমোহন বর্মনের সঙ্গে দেখা করতে পারি। খুবই আগ্রহের সহিত দেখা করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। শুরু হল আমার জীবনের এক নূতন অধ্যায়।

—তিন—

॥ ত্রিপুরায় কংগ্রেস আন্দোলন ॥

১৯০৭ সালে কুমিল্লায় এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল। এই দাঙ্গা প্রতিরোধের কৃতিত্বের জন্য কুমিল্লার তরুণদের উপর সারাদেশের দৃষ্টি পড়ে।

১৯০৮ সালে ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতারা এসে কুমিল্লায় তাঁদের গুপ্ত বিপ্লবীদলের শাখা গঠন করেন। কলকাতা থেকে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতাও ব্রতী সমিতি গঠন করার জন্য কুমিল্লায় লোক পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রেরিত ব্যক্তি বিশেষ কৃতকার্য হননি। সে সময় অনুশীলন সমিতিই তরুণদের বেশী আকৃষ্ট করত। পরবর্তীকালে যুগান্তর দলও কুমিল্লায় নিজেদের সংগঠন গড়ে তোলে। তখনকার কুমিল্লায় যুগান্তর দলের বিশিষ্ট নেতা ও কর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মনোমোহন চৌধুরী, বসন্তকুমার মজুমদার, ললিত চৌধুরী, কুলচন্দ্র সিংহ রায়, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ দাস সুরেশচন্দ্র দেব, যোগেশচন্দ্র রায়, কুমুদ নাগ প্রভৃতি।

১৯১৪ সালে সুরেশ চন্দ্র দাস সেকালের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র কিশোর ললিতমোহন বর্মনকে বিপ্লবী দলে রিক্রুট করেন।

১৯১৮ সালে ললিতমোহন বর্মন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করে আরও কয়েকজন সতীর্থের সঙ্গে বৈপ্লবিক কর্মে পূর্ণোদ্যমে আত্মনিয়োগ করেন। সেই সময় কুমিল্লা জিলা স্কুলের কৃতী ছাত্র রেবতী বর্মনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। রেবতী বর্মনের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ আরও বিস্তারিতভাবে পরে উল্লেখ করব।

১৯১৯ সালে রাওলাট আইনের প্রতিবাদে গান্ধীজী রাজনীতির আসরে অবতীর্ণ হলেন।

জালিওয়ানালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে ও মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারে সারাদেশে অভূতপূর্ব আলোড়ন দেখা দিল। কলকাতা কংগ্রেসে

মহাত্মাজীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হল। আইন-আদালত স্কুল-কলেজ ও বিলাতী দ্রব্য বর্জনের সঙ্কল্প গ্রহণ করল দেশের মানুষ।

১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসের পর চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যারিস্টারি বৃত্তি পরিত্যাগ করে দেশের কাজে নেমে পড়লেন। দেশবাসী তাঁর এই স্বার্থত্যাগে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'দেশবন্ধু' উপাধি দান করল।

অসহযোগ আন্দোলন শুরু হতেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই আন্দোলনের পক্ষে প্রচারের জন্য কুমিল্লায় এলেন। মহেশ প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসভায় তিনি সকলকে আহ্বান জানালেন এই আন্দোলনে অংশ নেবার জন্য। তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অখিলচন্দ্র দত্তের নেতৃত্বে কুমিল্লায় প্রায় ত্রিশ জন উকিল নিজেদের জীবিকা ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং আন্দোলন পরিচালনার জন্য তাঁদের এক একজন এক একটি থানার ভার গ্রহণ করেন।

এই অসহযোগ আন্দোলনের সময়ই প্রথম ত্রিপুরা জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। অখিলচন্দ্র দত্ত হলেন সভাপতি এবং অনঙ্গমোহন ঘোষ সম্পাদক। চাঁদপুরের বিখ্যাত নেতা হরদয়াল নাগও আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করে আন্দোলনে যোগ দিলেন। অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হলে অনেক আইনজীবি তাঁদের আইন ব্যবসায় ফিরে যান, কিন্তু হরদয়াল নাগ ঐ ব্যবসায় আর ফিরে যাননি।

ভগীরথ যেমন গঙ্গাকে পথ দেখিয়ে এনে নবজীবনের সঞ্চার করেছিলেন, তেমনি ললিতমোহন বর্মনও অসহযোগ আন্দোলনের স্রোতধারা এনে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে নবজীবনের সূচনা করলেন।

১৯২১ সালের ২১শে নভেম্বর যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে সারা দেশে হরতালের ডাক দেওয়া হয়। কলকাতায় এই ধর্মঘটকে সফল করার জন্য সুভাষচন্দ্র বসু যেমন দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তেমনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দায়িত্ব নিয়েছিলেন ললিতমোহন বর্মন। তাঁর ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা ও বিজ্ঞপ্তিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়াবাসীরা হরতালকে

সার্থক করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। ইংরেজ শাসকারও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রইল না। মহকুমা হাকিম T. H. Elis স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বেআইনী ঘোষণা করে এবং ললিতমোহন বর্মন, বসন্তকুমার মজুমদার প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে।

নেতারা বন্দী হলেও আন্দোলন বন্ধ হয়নি। পরদিন থেকে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক মাথায় গান্ধীটুপি পরে পথে পথে প্যারেড ও দোকানে দোকানে পিকেটিং করে কারাবরণ করতে থাকে। এই আন্দোলনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সর্বপ্রথম প্রায় ১৫।২০ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রতাপচন্দ্র সাহা, পূর্ণ চক্রবর্তী, বিধুভূষণ দাস ও মহানন্দ কর।

দেশবন্ধু ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা কংগ্রেস কমিটিকে এই কার্যের জন্য অভিনন্দন জানালেন এবং এক বিবৃতিতে বল্লেন—"Brahmanbaria is ready with more victims than our masters want."

আন্দোলন দমন করার জন্য প্রভুদের পীড়নও কম ছিল না। সাহেব আলি নামে এক মুসলমান স্বেচ্ছাসেবককে শুধুমাত্র গান্ধীটুপি পরার অপরাধে মিঃ ইলিশ দশদিনের কারাদণ্ড দেন। বেআইনী ঘোষিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পরিচালনা করার জন্য রূপেন্দ্র পাল ও সুরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রতি বেত্রদণ্ডের আদেশ হয় এবং মিঃ ইলিশ প্রকাশ্য আদালতে তাদের দশ ঘা বেত্রাঘাত করেন। বিচারের নামে এই অত্যাচারের ফলে তীব্র ব্রিটিশ বিদ্বেষ সারা মহকুমায় ছড়িয়ে পড়ে।

ত্রিপুরা জেলায় অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করে ললিত মোহন বর্মন সর্বপ্রথম কারাবরণ করেন। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘটের ব্যাপারেও তিনি দণ্ডিত হয়েছিলেন। তিনি মুক্তিলাভ করলে কুমিল্লার মহেশ প্রাঙ্গনে এক বিরাট জনসভায় অনঙ্গমোহন ঘোষের সভাপতিত্বে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়।

ললিতমোহন বর্মন কংগ্রেসের আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার সাথে সাথে গঠনমূলক কাজও করেন।

॥ চিত্তরঞ্জন জাতীয় প্রতিষ্ঠান ॥

১৯২১ সালে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশে এই বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'চিত্তরঞ্জন জাতীয় প্রতিষ্ঠান'।

জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কার্যকরী শিক্ষাদানের জন্য সেখানে তাঁত ও দেশলাইয়ের কারখানা ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করেছি ভারতবর্ষে ডাঃ মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী সর্বপ্রথম দেশলাই তৈরীর কল আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর নির্মিত কলই এখানে স্থাপিত হয়েছিল। এই জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রথম সভাপতিও ছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী। পরে অখিলচন্দ্র দত্ত ও দেবেন্দ্র তলাপাত্র এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হয়েছিলেন। দেবেন্দ্র তলাপাত্র ও ললিতমোহন বর্মনের প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটি দিনে দিনে উন্নতি লাভ করেছিল।

জাতীয় বিদ্যালয়ে দেশাত্মবোধক পুস্তকের একটি লাইব্রেরী ছিল। বিপথগামী ছেলেদের চরিত্রের উন্নতির জন্যও একটা বিভাগ ছিল। তাছাড়া ছিল সেবাসমিতি, তার সম্পাদক ছিলেন বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য। কলেরা বসন্ত মহামারীতে সেবাশুশ্রূষা করত এই সমিতি।

এই স্কুলটিতে বিনা পারিশ্রমিকে যে সব শিক্ষক পড়াতেন তাদের মধ্যে ছিলেন কুলেন্দ্র পাল, প্রভাত মজুমদার, নরেশ বর্মন, আশু পাল, মহম্মদ ওসমান গণি, যোগেশ রায়, মণীন্দ্র চক্রবর্তী, ব্রজেন্দ্র চক্রবর্তী, তারাকিশোর বর্ধন, সুরেশ দেব, যতীন দে, ও বিনোদ চৌধুরী।

অসহযোগ আন্দোলন যখন ক্রমশঃ বেগবান হয়ে উঠছিল, তীব্রতর রূপ নিচ্ছিল, তখন এক অখ্যাত স্থানের একটি ঘটনাকে উপলক্ষ

করে গান্ধীজী অকস্মাৎ 'ব্রেক কষে' আন্দোলনের গতি রুদ্ধ করে তাকে থামিয়ে দিলেন। ১৯২২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী চৌরিচোরা থানায় ক্রুদ্ধ জনতার হাতে একজন দারোগা ও একুশজন পুলিশ নিহত হলে গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। চারদিক থেকে দেশের অন্যান্য নেতারা আপত্তি জানালেন, কিন্তু তিনি তাদের কথায় কর্ণপাত করলেন না।

১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন থেমে গেল। দেশপ্রেমের জোয়ার শেষে ভাঁটার টান শুরু হল। স্কুল-কলেজ, কোর্ট-কাছারীতে লোকেরা আবার ফিরে যেতে লাগল।

মানুষের মনে দেশপ্রেমের স্রোতধারা অব্যাহত রাখার জন্য ললিতমোহন বর্মন গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ত্রিপুরার গ্রামে গ্রামে তিনি ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ ও স্লাইডসের সাহায্যে বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, ইংরাজের অর্থনৈতিক শোষণ, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস ইত্যাদি প্রচার করতে শুরু করেন। বক্তৃতা দেবার জন্য তিনি নোয়াখালি, শ্রীহট্ট, ঢাকা, মৈয়মনসিংহ প্রভৃতি জেলাতেও গিয়েছিলেন। প্রচারকার্যের সাথে সাথে তিনি সারা মহকুমার জন্য এক ব্যাপক কর্মসূচীও প্রস্তুত করেন এবং চিত্তরঞ্জন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বাধীনে এই কর্মসূচীর রূপায়ন কার্য পরিচালনা করেন। সেই সময় এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি সম্পাদক ও অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলেন যথাক্রমে অখিলচন্দ্র দত্ত, দেবেন্দ্রচন্দ্র তলাপাত্র ও ললিতমোহন বর্মন। দেবেন্দ্র তলাপাত্র ছিলেন ললিতমোহন বর্মনের বিশ্বস্ত সহকর্মী, তিনি আজীবন এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য কাজ করে গেছেন, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সবচেয়ে অনুন্নত সম্প্রদায় ঋষি, চামার, মেথর ও গ্রাম্য কৃষকদের নিরক্ষরতা দূর করার জন্য তেইশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। এগুলির মধ্যে ভাতৃঘর, নাট্যঘর প্রভৃতি গ্রামের

'ঋষি বিদ্যালয়', পয়াগ ও নরসিংহসারের চাষী বিদ্যালয় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। ললিতবাবুর বিপ্লবী সতীর্থ প্রমথ ভট্টাচার্য ও বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বিদ্যাকূট গ্রামে একটি পল্লীসংগঠন এবং চরকা, তাঁত ও খাদি বস্ত্র বিক্রয় কেন্দ্র পরিচালিত হতে থাকে। তাছাড়া জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে রাজনীতিশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়, যার মাধ্যমে যুবকদের রাজনীতি, স্বাদেশিকতা ও জনসেবায় শিক্ষিত করে তোলা হতে থাকে।

কিন্তু পল্লী-উন্নয়ন, নিরক্ষরতা-দূরীকরণ, চরকা-খদ্দর বিক্রয়কেন্দ্র প্রভৃতি শুধুমাত্র গঠনমূলক কার্যের মধ্যে ললিতবাবু নিজের কর্মক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে রাখেননি। বৈপ্লবিক আন্দোলনের জন্যও তাঁর গোপন প্রয়াস ছিল।

১৯২২ সালে যশোহরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে তিনি ত্রিপুরার প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেছিলেন। সেখানে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে লাঠি নিয়ে কুচকাওয়াজ শিক্ষাদানের প্রস্তাব তিনি উত্থাপন করেন। বসন্ত মজুমদার সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। কিন্তু সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রস্তাবটিতে হিংসার গন্ধ আছে বলে বাতিল করে দেন।

এই প্রাদেশিক সম্মেলনে বাংলার বহু বিপ্লবীনেতার সঙ্গে ললিত বাবুর সাক্ষাৎ হয় এবং বৈপ্লবিক কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা হয়। যশোহর সম্মেলন শেষে ললিত মোহন বর্মন কলকাতায় যান রেবতী বর্মনের সঙ্গে দেখা করতে।

—চার—

॥ বিপ্লবী সংগঠন ॥

রেবতী বর্মনের সাথে হেমচন্দ্র ঘোষের গুপ্ত বিপ্লবীদলের সংযোগ ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছিল। তিনি চাইলেন যে তাঁর বন্ধু ললিতবাবুও হেমচন্দ্র ঘোষের দলে যোগ দিয়ে কাজ করুন এবং সেই উদ্দেশ্যে দলনেতার সঙ্গে ললিতবাবুর পরিচয় করিয়ে দিলেন। ললিতবাবু হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আলোচনার পর তাঁর দলের সঙ্গে কাজ করতে রাজী হয়ে গেলেন। হেমচন্দ্র ঘোষ ললিতবাবুকে নিয়ে ঢাকায় চলে যান এবং সেখানে অনিল রায়, লীলা নাগ, সত্য গুপ্ত, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

॥ কল্যাণ সংঘ ॥

১৯২৩ সালের জুলাই মাসে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কল্যাণ সংঘ নামে একটি লাইব্রেরী ও পাঠাগার স্থাপন করলেন। তার উদ্দেশ্য হল শহরের যুবকদের সংগঠিত করে বিপ্লবীদলের অন্তর্ভূক্ত করা। কল্যান সংঘের প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন ললিতমোহন বর্মন আর সেক্রেটারী স্থানীয় স্কুলের ছাত্র নৃপেন্দ্র মোহন পাল। এই সংঘের উৎসাহী সভ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মনীন্দ্র পাল, বারীণ ঘোষ, অমূল্যকাঞ্চন দত্ত রায়, অপূর্বকাঞ্চন দত্ত রায়, সুধাংশু ভট্টাচার্য, সুবোধ চৌধুরী, বিনয় দত্ত, বিনয় নন্দী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (বর্তমানে খ্যাতনামা সাহিতিক), পবিত্র দেব, সমরেন্দ্র নন্দী. অমর পাল, ধীরেন্দ্র চক্রবর্তী, হীরালাল দেব সুবোধ রায়, কামাখ্যা চক্রবর্তী, প্রফুল্ল চক্রবর্তী প্রভৃতি। লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, ব্যায়াম শিক্ষা ও পাঠাগারের মাধ্যমে শহরের প্রায় সকল ভাল মেধাবী ও চরিত্রবান ছাত্রদের এই সংঘে আকৃষ্ট করা হল এবং ক্রমে তারা বিপ্লবীদলের সদস্যও হয়ে গেল।

কল্যাণ সংঘের সভ্যরা কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মহামারীতে সেবাকার্য করে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠল। শহরের উকিল ডাক্তার প্রভৃতি

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমর্থন পেল। ফলে এই সংঘের উপর পুলিশের নজর পড়ল। একদিন কল্যাণ সংঘের গ্রন্থাগার ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানে থানাতল্লাসী হয়। এই পুলিশী হামলার প্রতিবাদে স্থানীয় ময়দানের এক জনসভায় ললিতবাবু পুলিশের হামলায় তীব্র সমালোচনা করেন। কল্যাণ সংঘের জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে যায় এবং শহরের প্রায় প্রতি পরিবারই কোন না কোন ভাবে কল্যাণ সংঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে।

কিছুদিন পরে সহকর্মী প্রমথ ভট্টাচার্যের উপর সংঘের সভাপতির দায়িত্ব অর্পন করে ললিত বর্মন পদত্যাগ করলেন।

তারপর ললিতবাবু মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠন প্রসারে মনোযোগ দিলেন। একদল কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিটি হাইস্কুল ও গ্রামে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ সহযোগে বক্তৃতা দিতেন। ইংরাজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তৃতা শুনে ও ছবি দেখে ছাত্ররা অনুপ্রাণিত হত, তাদের ধীরে ধীরে বৈপ্লবিক আদর্শে আকৃষ্ট করা হত, তারপর সে গ্রামে এক কেন্দ্র স্থাপন ও তার সঙ্গে গড়ে উঠত পাঠাগার ও ব্যায়ামাগার। এই ভাবে কিছুদিনের মধ্যেই মহকুমার বিভিন্ন স্থানে দলের শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করল।

ললিতবাবু ঢাকায় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ও দলের কাজ করার জন্য বিশ্বস্ত সহকর্মী বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যকে সেখানে পাঠান। বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হয়ে ঢাকায় কাজ করতে লাগলেন।

এখন হেমচন্দ্র ঘোষের বিপ্লবীদলের সঙ্গে ললিতবাবুর দলের সংযোগ সাধনকারী রেবতী বর্মন সম্পর্কে কিছু বলি।

॥ রেবতী বর্মন ॥

রেবতী বর্মন জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৩ সালে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার শিমূলকান্দি গ্রামের এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে।

১৯২১ সালে গান্ধীজীর আহ্বানে রেবতী বর্মন কুমিল্লা জিলা স্কুল বর্জন করে প্রবল উৎসাহ নিয়ে আন্দোলনে যোগ দিলেন, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উপস্থিত হলেন না। তিনি ঐ বৎসরে অনুষ্ঠিত বরিশাল রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দেন। চাঁদপুরে আসাম প্রত্যাগত চা-বাগিচার শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত ধর্মঘটেও অংশ গ্রহণ করেন। চা-শ্রমিকদের ধর্মঘট সারা দেশে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস কলকাতা থেকে ছুটে এসেছিলেন তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে। ডিঙ্গি নৌকোয় ঝড়ের বাধা উপেক্ষা করে তাঁদের চাঁদপুর পৌঁছানোর ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অসহযোগ আন্দোলন ও চা-শ্রমিক ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করার অপরাধে রেবতী বর্মনকে এসময় কিছুকাল কারাবাস করতে হয়েছিল।

রেবতী বর্মনের প্রথম জীবনে এই শ্রমিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার প্রভাব তাঁর সারাজীবনে ব্যাপ্ত ছিল। পরবর্তীকালে তিনি সাম্যবাদ নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেন এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বৈপ্লবিক দৃষ্টি-ভঙ্গি নিয়ে শ্রমিক আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা দেশের কমিউনিষ্ঠ সাহিত্য সৃজনের প্রথম যুগে তাঁর অবদান কম নয়। তাঁর লেখা বই ও প্রবন্ধাদি পড়ে অনেক লোক রুশ কমিউনিষ্ট পার্টি ও কমিউনিজম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে।

মেধাবী ছাত্র তিনি কৈশোরে স্কুল ছাড়লেও লেখাপড়া ত্যাগ করেন নি। ১৯২১ সালে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনের আদ্য পরীক্ষা দেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। কৃতিত্বের সাথে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় তিনি একটি বৃত্তিলাভ করেন। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অব্যবস্থার জন্য তাঁর মন সেদিকে আকৃষ্ট রইল না। তাই পরের বৎসর ১৯২২ সালে তিনি কিশোরগঞ্জের আজিমুদ্দিন হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলেন এবং

এই পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

কলেজে পড়ার জন্য তিনি কলকাতায় এলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই, এ, এবং সেণ্ট পল্‌স কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি, এ, তারপর অর্থনীতিতে এম, এ পাশ করেন এবং কৃতিত্বের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হলেও সক্রিয় রাজনীতি থেকে একদিনের জন্যও তিনি সরে দাঁড়ান নি। প্রচুর পড়াশোনা করলেও 'বইয়ের পোকা' তিনি কোনদিন হন নি। অধ্যয়ন ও সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলন এই ছিল তার জীবন দর্শন।

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পরে তিনি আবার দ্বিগুণ উৎসাহে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিলেন। বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ অনিল রায় প্রভৃতির সঙ্গে কাজ করেন। একদিকে তিনি যেমন বিপ্লবীদলের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে জনসেবামূলক প্রকাশ্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি একদিকে স্বরাজ্য পার্টির সক্রিয় কর্মী, অপরদিকে নিষ্ঠাবান জনসেবকরূপে পল্লীসেবক সঙ্ঘের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

গুপ্ত বিপ্লবীদলের ও সমাজসেবক প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছাড়া তিনি বাংলার যুব আন্দোলন ও ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও নেতা ছিলেন। বাংলার ছাত্র ও যুবকদের নবভাবে অনুপ্রাণিত করার জন্য এক নূতন ও মহৎ কার্যে তিনি জড়িত হন—তরুণদের মুখপত্রস্বরূপ 'বেণু' পত্রিকার প্রকাশ।

১৯২৬ সালে ৯৩।১ এফ্‌ বৈঠকখানা রোড থেকে প্রথম বেণু পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা প্রকাশের ব্যয় নির্বাহের জন্য রেবতী বর্মন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত স্বর্ণপদকটি বন্ধক রেখে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। এই প্রকাশের কাজে তিনি দুই কিশোর লেখকের সাহায্য পেয়েছিলেন, পরবর্তীকালে যাঁরা শিশু সাহিত্য রচনায় বিখ্যাত

হন। সেদিনের সেই দুই কিশোর লেখক হচ্ছেন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র মোহনলাল গাঙ্গুলি ও শোভনলাল গাঙ্গুলি।

বেণুর প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদস্বরূপ প্রেরণাদায়ক একটি গান প্রকাশিত হয়—

'মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি
হে রাখাল, বেণু তব বাজাও একাকী'।

বিপ্লবী-বাংলার অগ্নিবর্ষণকারী মধ্যাহ্নদিনে যখন তরুণদের অগ্নিনালিকা ঘন ঘন অগ্নিবর্ষণ করছিল শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি, তখন ঐ রাখালিয়া বেণুতেও বেজে উঠেছিল রুদ্ররাগিনী। রাগে উন্মত্ত হয়ে ইংরেজ সরকার বেণুর বহু সংখ্যা বজেয়াপ্ত করেছিলেন বাংলাদেশের পত্র পত্রিকার ইতিহাসে তরুণ বিপ্লবীদের পরিচালিত বেণু এক বিশিষ্ট স্থান দাবী করতে পারে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে কিছুদিন পর বেণুর সম্পূর্ণ পরিচালনার ভার ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় গ্রহণ করেন।

১৯৩০ সালে ড্যালহাউসী স্কোয়ারে পুলিশ কমিশনার কুখ্যাত টেগার্টের গাড়ীর উপর বোমা পড়ল। টেগার্ট বেঁচে যায়, কিন্তু ঘটনাস্থলেই মারা যান বিপ্লবী অনুজা সেন। তারপর পুলিশ সারা কলকাতা তোলপাড় করে ফেলে, চারদিকে হানা দিয়ে বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করতে থাকে। সেদিনই রেবতী বর্মন ধরা পড়ে যান এবং বিনাবিচারে আট বৎসর বন্দীশিবির ও অন্তরীণে ছিলেন।

১৯৩২ সালে বাংলার বিশিষ্ট বিপ্লবীদের বিনা বিচারে রাজবন্দী করে দেউলি বন্দী শিবিরে দলে দলে প্রেরণ করা হয়েছিল।

প্রেসিডেন্সী জেল থেকে প্রথম যে দলটিকে রাজপুতনার দেউলি বন্দী শিবিরে পাঠান হয়, তাতে রেবতী বর্মন এবং আমিও ছিলাম। এই দেউলি বন্দী শিবিরেই তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। একই ঘরে পাশাপাশি বাস করেছি দু'বছর। তখন দেখেছি সকাল থেকে গভীর রাত্ত পর্যন্ত প্রায় সব সময়ই

লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তিনি। পড়াশুনার মাধ্যমেই তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেন, মার্কসীয় দর্শন ও অর্থনীতিতে অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন।

বন্দীশিবিরে অনেকেই স্বীয় কর্মক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেছিলেন। অনেকে পরীক্ষা দিয়ে ইউনিভার্সিটি ডিগ্রী লাভ করেন। আমি দেউলি শিবির থেকে বি, এ, পাশ করেছিলাম। সেখান থেকে পরীক্ষা দিয়ে ইংরেজীতে Ist. class 2nd হয়েছিলেন সরোজ আচার্য। কেউ কেউ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন। দেউলিতে মার্কসবাদ লেলিনবাদ নিয়ে পড়াশোনা, আলোচনা, বৈঠক, বিতর্কসভা, হাতে লেখা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি সব কাজেই রেবতীবাবুর অসীম উৎসাহ ছিল। মার্কসবাদ পড়াবার জন্য তিনি রীতিমত টিউটোরিয়েল ক্লাশ খুলে ফেল্লেন। তিনি যখন Capital পড়াতেন তখন মনে হত বইটির প্রতিটি লাইন তার কণ্ঠস্থ। এমনি অসাধারণ ছিল তাঁর মেধা ও উৎসাহ। সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন। কাকেও পড়াচ্ছেন অর্থনীতি, কাকেও শরীর বিজ্ঞান, কাকেও দর্শন। যে বিষয়ই শিখতে ও জানতে চাই রেবতীবাবুর কাছে গেলে নিরাশ হবার সম্ভাবনা ছিল না।

১৯৩৮ সালে মুক্তিলাভের পর তিনি মার্কসবাদ লেনিনবাদ প্রচার কাজে ও শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। মার্কসবাদ সহজবোধ্য করার জন্য তিনি ঢাকা থেকে "গণশিক্ষা সিরিজ" প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষায় সহজবোধ্যরূপে মার্কসবাদ শিক্ষাদায়ক বহু পুস্তিকা তিনি রচনা করেছিলেন। বিখ্যাত গ্রন্থ মার্কস-এর ক্যাপিটালের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ বাংলায় তিনি প্রথম প্রকাশ করেন। সর্বপ্রথম ভারতীয় ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদের দাবী তাঁরই।

কলকাতায় মার্কসবাদী লেনিনবাদী সাহিত্যের জন্য একটি বিশেষ প্রকাশন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তাঁর বন্ধু গোপাল ঘোষের নিকট হতে দু'শো টাকা পুঁজি নিয়ে এই উদ্যোগে অগ্রসর হন।

সামান্য টাকায় একটি ঘর ভাড়া নিলেন ৭২ নং হ্যারিসন রোডে। সুরেন দত্ত নিলেন পরিচালনার ভার। এখনকার বিখ্যাত মার্কসবাদী সাহিত্য প্রকাশক 'ন্যাশানল বুক এজেন্সী লিমিটেড' প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় রেবতী বর্মনের উদ্যোগেই। এ ছাড়া বর্মন পাবলিশিং হাউস থেকে তাঁর কিছু বই প্রকাশিত হয়েছিল। তার রচিত পুস্তক 'তরুণ রুশ' (১৯২৮) 'মার্কসীয় অর্থনীতি', 'সোবিয়েৎ ইউনিয়ন', 'পরিবার', 'হেগেল ও মার্কস', 'লেনিন ও বলশেভিক পার্টি', 'সমাজের বিকাশ', 'মার্কস প্রবেশিকা' ও 'ধর্ম'। তাঁর সর্বশেষ বই 'মানব সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ' তাঁর মৃত্যুর পর ন্যাশানল বুক এজেন্সী হতে প্রকাশিত হয়।

ডাক্তারের পরামর্শে তিনি বেলঘরিয়াতে বাস করছিলেন ও সেখানেই কর্মকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে কলকাতা ও ২৪ পরগণা হতে বহিষ্কার করা হয়। তিনি পুনরায় স্বগ্রাম শিমূলকান্দিতেই ফিরে গেলেন। সেখানে তিনি দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। এই মারাত্মক রোগও তাঁকে তাঁর লেখাপড়ায় বাধা দিতে পারেনি। 'মানব সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ' ঐ সময়ই লিখেছিলেন।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি আগরতলার নিকটে অরুন্ধতী পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন—প্রকৃতির শান্ত পবিবেশে শেষ কটা দিন কাটাবার জন্য।

১৯৫২ সালের ৬ই মে মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন রেবতী বর্মন।

অদ্ভুত মেধাবী ছাত্র, আমরণ বিপ্লবী, বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী, অসামান্য তাত্ত্বিক নেতা রেবতী বর্মনের মত এক বিরাট প্রতিভা অকালে ঝরে গেল।

॥ ললিতমোহন বর্মন ॥

গুপ্ত বিপ্লবীদলের সদস্য বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য আমাকে দলের নেতা ললিত বর্মনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন বলায় আমার মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দ ও উত্তেজনার ঢেউ জাগল। তরুণ মনে গোপন কার্য কলাপ সম্বন্ধে এক স্বাভাবিক মোহ সব সময়ই থাকে। এ্যাডভেঞ্চারের নেশায় সর্বদাই সে উন্মত্ত। তাই আসন্ন সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে আমি মনে মনে রঙিন কল্পনার জাল বোনা শুরু করলাম। গুপ্ত বিপ্লবীদলের সভ্যপদ লাভ সম্ভাবনার রোমাঞ্চকর অনুভূতি আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে ভাষায় যথারীতি প্রকাশ করতে অক্ষম। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, মনে হয়েছিল, 'রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা…'

কিছুদিন পরে বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য আমাকে নিয়ে গেলেন ব্রাহ্মণ-বাড়িয়ায়। ললিতমোহন বর্মন সেখানেই থাকতেন। আমাদের কালীকচ্ছ গ্রাম থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দূরত্ব ছিল আট মাইল। সেযুগে এ পথটুকু পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করতে হত।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জাতীয় প্রতিষ্ঠানে আমায় নিয়ে গিয়ে বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য পরিচয় করিয়ে দিলেন বিপ্লবী নেতা ললিতমোহন বর্মনের সঙ্গে। প্রথম দর্শন লাভে আমি কিন্তু খুব হতাশ হয়েছিলাম। বিপ্লবীনেতা সম্বন্ধে কল্পনায় যে রঙিন ছবি এঁকেছিলাম, বাস্তবে তার সঙ্গে কোন মিলই খুঁজে পেলাম না। বিপ্লবী দলনেতা বলতে শরৎবাবুর 'পথের দাবী'র সব্যসাচীর মতো এক অদ্ভুত মানুষের দর্শন পাব আশা করেছিলাম, যার দেহে অসীম শক্তি, দুহাতে রিভলবার চালাতে দক্ষ, ক্রিকেট বলের মতো বোমা নিয়ে লোফালুফি করেন, বিদ্যুতের মতো বেগে ঘোড়া ছোটাতে পারেন। এমনিধারা এক সুপারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাতের কল্পনা আমি করেছিলাম। কিন্তু তার বদলে দেখা হল ছোটখাটো একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে, খদ্দরের ফতুয়া গায়ে, পরনে ছোট খদ্দরের ধুতি ও গায়ে খদ্দরের চাদর।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমি অবশ্য পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি ঐ সাধারণ মানুষটির মধ্যেই অসাধারণত্ব কিভাবে লুকনো ছিল। আমার কল্পনা মতো যদি মানুষটির আকার প্রকার হত তাহলে তাঁকে নিয়ে বেশ রোমহর্ষক গল্প লেখা চলত, কিন্তু সারাদেশ জোড়া ইংরেজ পুলিশের বেড়াজাল এড়িয়ে কোন বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সেই মানুষটির দ্বারা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

ললিতমোহন বর্মন প্রথম দর্শনে আমাকে হতাশ করলেও প্রথম আলাপে আমাকে মুগ্ধ করলেন। কথায় আছে 'পহলে দর্শন-দারি পিছে গুণ বিচারী।' কিন্তু আমার মনে হয় ঐ কথাটা মঞ্চ অভিনেতা সম্বন্ধে খাটতে পারে, বিপ্লবী নেতা সম্বন্ধে নয়। চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতা সূর্য্য সেন ওরফে মাষ্টারদাকেও দেখতে খুব সাধারণ ছিল, কিন্তু কাজে যে কত অসাধারণ ছিলেন তা আজ প্রমাণিত হয়ে গেছে। বিপ্লবীদের বিচার করার মাপকাঠি তাঁর আকৃতি নয়, প্রকৃতি।

বিপ্লবী নেতা ললিতমোহন বর্মন আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বল্লেন যেন আমি তাঁর খুবই পরিচিত আপনার জন। আমাকে তিনি তাঁর নিজ বাড়ী পৈরতলায় নিয়ে গেলেন। সেখানে আমার আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। রাত্রে তিনি আমার সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। দেশ বিদেশের মুক্তি আন্দোলন, পথের দাবী, গীতা, আনন্দমঠের বিষয় বস্তু, ক্ষুদিরাম, কানাই লাল, বাঘা যতীন প্রভৃতির দেশপ্রেম বীরত্ব ও আত্মোসর্গের কাহিনী শোনালেন। অবশেষে এলেন ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ও স্থানীয় কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনায়। কথা প্রসঙ্গে জানালেন যে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে কংগ্রেস আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং এই প্রকাশ্য আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করে গোপনে বিপ্লবী সংগঠণ গড়ে তুলছেন। বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর এই গুপ্তদলের একজন কর্মী, সক্রিয় বিশ্বস্ত সদস্য। তিনি আরও জানালেন বিপ্লবী দলে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের নানা

প্রকার নির্যাতন, কারাদণ্ড, এমনকি ফাঁসির জন্যও প্রস্তুত থাকতে হয়। দেশ-মাতৃকার বন্ধন-মুক্তির জন্য দেশের যুবকদের আত্মবলিদান করতে হবে। বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা আসবে না।

আলোচনার শেষে তিনি বল্লেন যে, আমি বিপ্লবীদলভুক্ত হয়ে কাজ করতে চাই কিনা তা ভাল করে ভেবে এক সপ্তাহ পর যেন তাঁর সঙ্গে আবার দেখা করি।

পরদিন বাড়ী ফিরে আসার সময় তিনি আমাকে একটা চরকা দিয়ে দিলেন বাড়ীতে সুতো কাটার জন্য। এই রোমাণ্টিক সাক্ষাৎকারের শেষে রিভলভারের বদলে চরকা হাতে স্বগ্রামে ফিরে এলেও মন কিন্তু আমার কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল উত্তেজনা ও আনন্দে।

বিপ্লবীনেতা আমায় ভাল করে ভেবে-চিন্তে তবে দুর্গম পথে পা বাড়াবার কথা বলেছেন। সপ্তাহখানেক সময়ও দিয়েছেন। কিন্তু আমার কাছে তখন আর ভাবনা-চিন্তা করার কিছু নেই। আমার অবস্থা তখন 'গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার, উদ্দাম পথিক।'

ললিত মোহন বর্মণের সঙ্গে কথা বলার সময়ই আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম যে, বিপ্লবী দলে যোগ দেব। যথাসময়ে তাঁকে আমার সুদৃঢ় সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলাম এবং তিনিও আমার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলেন। তাঁর দলের সভ্য হয়ে আমি কাজ শুরু করলাম।

আজ পিছনে চেয়ে সেই বিপ্লবীজীবনের প্রথম দিনগুলির কথা স্মরণ করলে তিনি যে কথাগুলি বার বার আমাদের বলতেন তা যেন কানে বেজে উঠে। 'আনন্দ মঠে'র সেই কথাগুলো—

'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?'

এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল। 'তোমার পণ কি?'

প্রত্যুত্তর 'পণ আমার জীবন সর্বস্ব।'

প্রতিশব্দ হইল, 'জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।'

'আর কি আছে? আর কি দিব?'

তখন উত্তর হইল—'ভক্তি'।

মনে পড়ে ব্রাহ্মাবাড়িয়ার কামিনী ভট্টাচার্যের রচিত সে যুগের বিখ্যাত গান—

'অবনত ভারত চাহে তোমারে
এস সুদর্শনধারী মুরারী

মঙ্গল ভৈরব শঙ্খ নিনাদে
বিচূর্ণ কর সব ভেদ বিবাদে।'

মনে পড়ে সভা-সমিতিতে গীত আমাদের প্রিয় গান—

'শাসন সংযত কণ্ঠে জননী
গাহিতে পারি না তোমার গান।'

মনে পড়ে বিপ্লবীদের আদর্শ নায়ক 'পথের দাবী'র সব্যসাচীর কথা—'দূর থেকে এসে যারা আমার জন্মভূমি অধিকার করেছে, আমার মনুষ্যত্ব, আমার মর্যাদা, আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, সমস্ত যে কেড়ে নিল, তারই রইল আমাকে হত্যা করার অধিকার আর রইল না আমার?'

এইসব কথাগুলো ছিল সেদিনের বিপ্লবী তরুণদের জপমন্ত্র।

* * * *

বিপ্লবীদলে যোগ দেবার পর আমার কর্মজীবন নূতন ভাবে শুরু হল। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে বাবা-মাকে প্রণাম, তারপর গীতাপাঠ। স্কুল থেকে ফিরে এসে ব্যায়াম। ব্যায়ামের সাথী ছিল 'দরিদ্র ভাণ্ডারে'র সহকর্মীরা। তাদের নিয়ে লাইব্রেরীর কাজও করি। আর সচেষ্ট রইলাম ভাল ছেলেদের গুপ্তদলে টেনে আনার জন্য। আমার প্রচেষ্টাকে সাহায্য করার জন্য ললিত বাবু একবার

কালীকচ্ছে এলেন। গোপন উদ্দেশ্য গোপনেই রইল। প্রকাশ্যে প্রচার করা হল ম্যাজিক ল্যান্টার্ণের সাহায্যে 'স্বদেশী বক্তৃতা' হবে। তাঁর কয়েকটি বক্তৃতার ফলে গ্রামের ছেলেদের মধ্যে বেশ উৎসাহ দেখা দিল। ক্রমে গড়ে উঠল একটি শাখা, দলে এল কয়েকটি ছেলে। তাদের মধ্যে মনে পড়ে অমৃত বর্দ্ধন, শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্য, চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র দত্ত, শিবেন্দ্র চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্র চক্রবর্তীর কথা।

সে সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরী থেকে দেশাত্মবোধক বই এনে পড়াও আমাদের একটা বড় কর্তব্য ছিল।

এমনি ধারা কাজকর্মের মধ্যে এসে গেল আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার দিন।

১৯২৬ সালের মার্চমাসে আমাদের ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হল। পরীক্ষায় পাস করার পর ডাক্তারী পড়ার বাসনা মনে ছিল। আমাদের বংশে অনেকেই চিকিৎসা-বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। চিকিৎসা-বৃত্তির প্রতি আমাদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল।

সেই উদ্দেশ্য নিয়ে গেলাম নারায়ণগঞ্জে আমার এক পিসিমার বাড়ী, ঢাকায় মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হবার ব্যবস্থা করতে। গ্রামের ছেলে আমি, জীবনে সেই প্রথম এক বড় শহরে যাচ্ছি, কাজেই মনে নানা কল্পনা, নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা উদয় হল।

বড় শহর ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ দেখে আমি বিস্ময়ে মুগ্ধ হলাম। বিস্ময়ের সাথে দ্বিধা সঙ্কোচের ব্যাপারও জড়িত ছিল। গেঁয়ো ছেলে শহুরে ছেলেদের সঙ্গে ঠিক খাপ খাইয়ে চলতে পারব কিনা এ রকম এক আশঙ্কা মনে জেগেছিল। আমার চোখে পিসিমার ছেলেরা একেবারে ধোপদুরস্ত বাবু। তারা একটু ময়লা কাপড় পরে না, পালিশ করা জুতো না হলে চলে না। তাছাড়া তাদের প্রত্যেকেরই বেশ কয়েক জোড়া জুতো রয়েছে। আমার সেই তৎকালীন ছেলেবেলার পরম স্মরণীয় ঘটনা 'ঢাকা গমন' উপলক্ষ্যে ভাল জামা-জুতো পরেই গ্রাম থেকে এসেছি, জুতো অবশ্য একজোড়াই।

অন্যদের চালচলন দেখে মহাভাবনায় পড়ে গেলাম। শহুরে বাবুদের জুতো না হলে ঘর থেকে বের হওয়াই চলে না। আমরা গ্রামে খালি পায়ে হাঁটতেই বেশী অভ্যস্ত। তাই শহরে এসে আমার পদবৃদ্ধি না হলেও পাদুকাবৃদ্ধির সমস্যা বিচলিত করে তুলল। সেই বয়সে এই সামান্য সমস্যাই আমার কাছে এমন গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল যে চিন্তা করছিলাম গ্রামেই ফিরে যাব কিনা। আজ অবশ্য এসব কথা ভাবলে হাসি পায়। মানুষের জীবনটাই এমনি, আজ যা গুরুতর সমস্যা বলে আমাদের চিন্তিত করছে, কাল সেটা হয়তো হাস্যকর ব্যাপার হয়ে উঠে।

যাহোক, সেই বয়সে জীবনের একটা আদর্শের সন্ধান পাওয়ায়, লক্ষ্য স্থির থাকায় এই সব সামান্য সমস্যা আমাকে বিচলিত করলেও বিচ্যুত করতে পারে নি। একদিন ঢাকা মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলের খ্যাতনামা সার্জন ডাঃ নৃপেন বসুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অমন সুন্দর স্বাস্থ্যবান গৌরবর্ণের পুরুষ আগে দেখিনি। তাঁকে দেখতে যেমন সুন্দর ব্যবহারও তেমনি সুন্দর। সাক্ষাৎ করতে এসেছি শুনেই ডেকে পাঠালেন। কিন্তু তাঁকে দেখেই আমার বিস্ময়ের বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় বক্তব্য সেই স্রোতে ভেসে যাওয়ার উপক্রম হল। কোন রকমে নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম।

তিনি খুব সহৃদয়তার সঙ্গে মন দিয়ে আমার আকাঙ্ক্ষার কথা শুনলেন। তারপর আশ্বাস দিয়ে বল্লেন, প্রথম ডিভিশনে পাস করতে পারলে তিনি আমার মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলে ভর্তি ও অন্যান্য সাহায্য করবেন। শুধু প্রথম বিভাগে পাস করেছি এই খবরটা তাঁকে দিলেই চলবে।

তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমি খুব খুশি হলাম। ডাক্তারী পড়ায় আমার আর কোন বাধা নেই। এখন শুধু পরীক্ষার ফল কবে বের হবে তার জন্য অপেক্ষা করা। প্রথম বিভাগে যে পাস করতে পারব এমন একটা আত্মবিশ্বাস আমার ছিল।

নিজের গ্রামে ফিরে না গিয়ে আমি পিসিমার বাড়ী নারায়ণগঞ্জেই পরীক্ষার ফল বের হওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করলাম।

প্রচুর অবসর। শীতলক্ষ্যার ঢেউ গুণে সময় কাটাই, একা একা শহর ঘুরে দেখি। রমনার কালীবাড়ী দেখি, মাঠ দেখি। মেডিকেল স্কুল দেখি, ইউনিভার্সিটি দেখি, বেশ আনন্দেই দিন কাটতে লাগল। প্রথম যৌবনের স্বপ্ন মধুর দিনে ভবিষ্যৎ জীবনের নানা ছবি কল্পনার রঙে এঁকে চলি।

একদিন সকালে খবর পেলাম যে, স্থানীয় পাঠাগারে গেজেট এসেছে, তাতে ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বের হয়েছে। ঠাকুর দেবতার নাম করতে করতে দুরু দুরু বুকে হাজির হলাম পাঠাগারে। এক ফাঁকে নিজের নম্বরটা দেখে নিলাম। প্রথম বিভাগেই পাস করেছি, তক্ষুণি ছুটলাম ডাঃ নৃপেন বসুর কাছে।

তিনি আমার খবর শুনে বললেন—'বাড়ি গিয়ে বিছানা-পত্তর ও কিছু টাকা নিয়ে চলে এসো, তারপরের সব ব্যবস্থা আমি করে দেব।'

আজও তাঁর এই কথাগুলি আমার কানে বাজে। আত্মীয়-স্বজন নয়, ঘনিষ্ঠজনের কেউ নয়, দূর গাঁয়ের কোন অজানা অচেনা এক ছেলের জন্য তাঁর এই দরদ ও সহানুভূতি চরিত্রের মহত্বের পরিচয় দেয়। পরিচয় দেয় তার পরোপকার প্রবৃত্তির। আজও চোখের সামনে সৌম্য, শান্ত, ছাত্রদরদী সেই চিকিৎসকের মূর্তি ভেসে উঠে এবং আমি মনে মনে তাঁকে প্রণাম জানাই।

* * *

স্বগ্রামে ফিরে এলাম। পাসের খবর এবং ডাক্তারি পড়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে শুনে বাবা-মা সকলেই খুব খুশি হলেন। আমার মনে তো আর আনন্দ ধরে না। এবার খবরটা জানাতে ছুটলাম দলের নেতা ললিতমোহন বর্মণের কাছে।

তিনি সব শুনলেন, কিন্তু খুশি হলেন না। আমি তো অবাক!

কি হল ? কোন অন্যায় কাজ করে ফেল্লাম নাকি ? ডাক্তার হওয়া কি খারাপ ?

তিনি কিছুক্ষণ পর গম্ভীরভাবে বললেন, 'ব্যবস্থাটা তো ভালই করেছ, তবে আপাততঃ তোমার ঢাকা যাওয়া হবে না। বিপ্লবীদলের প্রয়োজনে তোমায় এখন কুমিল্লায় থাকতে হবে। ছু'বছর কুমিল্লা কলেজে পড়ে আই, এসসি, পাস করে তারপর ডাক্তারী পড়তে পার। এই ছু'বছর কুমিল্লায় আমাদের দলের একটা কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য কাজ করতে হবে।'

তিনি আরও জানালেন, কুমিল্লা হচ্ছে অনুশীলন দলের শক্ত ঘাঁটি। সেখানে অন্য কোন দল কোন দিনই স্থান পায় নি। অথচ জেলা শহরে সংগঠন না গড়তে পারলে আমাদের পার্টি বড় হবে না, মর্যাদা বাড়বে না। কুমিল্লায় কলেজ আছে, অনেক স্কুল আছে, সারা জেলার ছাত্রদের মিলন স্থান। সেখানে কাজের সুযোগ বেশী এবং সেজন্যই কুমিল্লা যেতে হবে, কুমিল্লা কলেজে পড়তে হবে।

দলনেতা গুরুদায়িত্বের বোঝা কাঁধে তুলে দিলেন। কঠিন সমস্যার সামনে আমায় ফেললেন। বিপ্লবীদলের সদস্যের ব্যক্তিগত ইচ্ছা আকাঙ্খার চেয়ে বড় হল পার্টির প্রয়োজন, নেতার নির্দেশ। সে নির্দেশ মেনে নিলাম।

বাবা-মাকে আমার মত পরিবর্তনের কথা জানানো হল। যুক্তি দেখালাম ছু'বছর কুমিল্লা কলেজে পড়ে আই. এসসি. পাস করে ডাক্তারী পড়াটা সুবিধাজনক হবে। তাঁরা আমার যুক্তি মেনে নিলেন। মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগটি আমি হারালাম বলে আপশোস করলেন না। আসল ব্যাপারটা—কোথা থেকে যে কি হল তা তাঁরা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারলেন না এবং আমিও দলের মন্ত্রগুপ্তি পালন করলাম।

১৯২৮ সালে ২৮শে মার্চ কুমিল্লা থেকে বাড়ী গেলাম বাবা অসুস্থ খবর পেয়ে। সেদিনই শেষ রাত্রে বাবা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ

করলেন। সে বছর আমি আই. এসসি. পাস করি বটে, কিন্তু ঢাকা গিয়ে ডাক্তারী পড়া আমার আর হল না। এখানে উল্লেখ করতে চাই আমার স্ত্রী শেফালি নন্দীরও আকাঙ্খা ছিল ডাক্তার হবার কিন্তু অবস্থা বিপর্যয়ে তা সম্ভব হয়নি। তবে আমার ছোট ছেলে শৈবাল নন্দী কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি. বি. এস. পাস করে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করার জন্য বিলেত যেতে সক্ষম হয়েছে।

॥ কুমিল্লায় ॥

১৯২৬ সালের জুন মাসে এলাম কুমিল্লায়। পূর্ববঙ্গের এক ছোট শহর এই কুমিল্লা। তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মুগ্ধ করল আমাকে। প্রথম দর্শনেই ভাল লেগে গেল, যাকে বলে—Love at the first sight. তার লাল মাটিতে রাঙানো চওড়া বড় বড় রাস্তা, দুপাশে বড় বড় গাছ, তার ছায়া ঢেকে রেখেছে রাস্তাগুলো। নানুয়ার দীঘি, রাণীর দীঘি, ধর্মসাগর প্রভৃতি বড় বড় দীঘি ও গোমতী নদী মনোরম করে তুলেছে শহরটিকে। আমার বিপ্লবী জীবনের প্রধান কর্মক্ষেত্র, যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময়, আনন্দ ও গৌরবের আকর, অগ্নি-যুগের রোমাঞ্চকর স্মৃতি বিজড়িত সেই কুমিল্লা আজও আমার মনকে দোলা দেয়। আজও 'মাঝে মাঝে কোন্ বাতাসে চেনা দিনের গন্ধ আসে।'

১৯২৭ সালে সরোজিনী নাইডু এসেছিলেন কুমিল্লায়। মহেশ প্রাঙ্গনে বক্তৃতামঞ্চে উঠে প্রথমেই বললেন যে, তিনি মুগ্ধ হয়ে গেছেন কুমিল্লার Tanks & Trees দেখে। দেশে বিদেশে অনেক ছোট শহর দেখেছি কিন্তু এমন একটি সুন্দর শহর চোখে পড়েনি কোথাও। বলতে ইচ্ছা করে,—'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।' আবার যদি ফিরে পেতাম সেই কুমিল্লা, সেই ১৯২৬ সাল, কি আনন্দই না হত।

পার্টি কুমিল্লায় শুধু আমাকেই পাঠায়নি। আরও যারা সেবছর

গেল তারমধ্যে ছিল ভুবনবিহারী বর্দ্ধন, অমূল্যকাঞ্চন দত্তরায় ও সুশীল বর্মণ।

আমরা সকলেই কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হলাম। তখন কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তিনি খুব ভাল ইংরেজী পড়াতেন, জনপ্রিয়ও ছিলেন।

॥ প্রমথনাথ নন্দী ॥

কুমিল্লায় আমার থাকবার ব্যবস্থা হল প্রমথনাথ নন্দীর বাসায়। পূর্বেই বলেছি তিনি কয়েক বছর জেলে ও অন্তরীণে কাটিয়েছেন, এখন ব্যবসা করার অভিপ্রায় নিয়ে কুমিল্লা বাস করছেন। আমি যখন গেলাম, তখন তাঁর ব্যবসা বিশেষ কিছুই ছিল না। আর্থিক অনটন, চাকর-বাকর নেই, নিজেই সব কাজ করেন, রান্নাও নিজে করেন। আমি গিয়ে তাঁর বোঝা বাড়ালাম, অবশ্য তাঁকে সব কাজে সাহায্য করার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না আমার। কঠিন কাজ রান্না, যার কিছুই জানতাম না তাও করার ব্যর্থ চেষ্টা করি। এক রাত্রে খিচুড়ি রান্নার জন্য আমাকে সব রকম নির্দেশ দিয়ে তিনি বাইরে গেলেন। আমি কৃতিত্ব দেখাবার একটা সুযোগ পেয়ে খুশি হয়ে গেলাম। ডাল-ভাত সেদ্ধ হয়ে গেছে, নির্দেশমত হাতায় তেল-মশলা গরম করে হাঁড়িতে ঢুকিয়ে দিলাম। কিন্তু ও হরি! সব খিচুড়ি যে উথলে পড়ে যায়। কি করে তা ঠেকাতে হয় তাও জানি না। বিস্ময়ে বোকার মত চেয়ে রইলাম হাঁড়িটার দিকে। এমন সময় প্রমথ বাবু এসে হাজির। আমিতো ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি। তিনি আমার অবস্থা বুঝে উৎসাহ দিয়ে বল্লেন, 'ভাবনা নেই যা অবশিষ্ট আছে তাতেই চলবে।' অর্ধভুক্ত হয়ে রাত কাটাতে হল দুজনকেই।

স্বাধীনচেতা, চতুর, বুদ্ধিমান ও পরোপকারী লোক ছিলেন তিনি। খুব ভাল ইংরেজী বলতে ও লিখতে পারেন বলে খ্যাতি ছিল তাঁর। কিছুকাল পর প্রমথ বাবুর ব্যবসায় উন্নতি হল। 'স্বপাক'-এর

প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। আমার দ্বিতীয় বার খিচুড়ি রান্নার আর সুযোগ এল না। পরবর্তী কালে প্রমথবাবু প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। তাছাড়া তাঁর বিশ্বাস ছিল আমি নাকি পয়মন্ত।

কুমিল্লা ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার পর আমার জন্য তাঁকে অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়েছিল। তিনি তখন আমাদের রাজনীতির মধ্যে জড়িত ছিলেন না, তবু পুলিস তাকে নানাভাবে নির্যাতন করেছিল। তাঁর স্ত্রী চপলা নন্দী ছিলেন শান্তি-সুনীতি যে স্কুলে পড়ত সেই সরকারী স্কুলের শিক্ষিকা। তাঁকে চাকরি থেকে সাসপেণ্ড করা হল। কর্মচ্যুতিরও ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু প্রখ্যাত সরকারী উকিল ভূধর দাশের চেষ্টায় চাকরিটির সমাপ্তি ঘটে নি।

কুমিল্লার সঙ্গে আমার এই পরিবারের স্মৃতিও বিজড়িত। এঁদের কথা আজও মনে পড়ে আর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি প্রমথনাথ নন্দীকে।

॥ অভয় আশ্রম ॥

ললিতবাবুর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই আমি খদ্দর ব্যবহার করতে শুরু করি। জামা, ধুতি, রুমাল সবই খদ্দরের। খদ্দরের আকর্ষণে প্রথমেই পরিচিত হলাম অভয় আশ্রমের সাথে। তাদের একটি দোকান ছিল কুমিল্লা শহরের কেন্দ্রস্থলে। তার পরিচালনার ভার ছিল মোহিত সেনের উপর। মোহিত সেন লোকটিকে আমার খুবই ভাল লাগত। নিরলস সরল কর্মী, মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত অভয় আশ্রমের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরই মাধ্যমে আমার পরিচয় হয়ে গেল অভয় আশ্রমের নেতাদের সঙ্গে। ডাঃ নৃপেন বসু, ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী, মিহির চ্যাটার্জী, জ্ঞানতরু হালদার, মহেন্দ্র হাজারিকা প্রভৃতি ত্যাগী দেশ সেবকদের সান্নিধ্যে এসে গেলাম কিছুদিনের মধ্যে। পরিচয়ের ক্ষেত্র ব্যাপকতর করে দলের কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করাই ছিল আমার লক্ষ্য।

কুমিল্লার প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী ও কংগ্রেস নেতা কামিনী কুমার দত্তের সঙ্গে ললিতমোহন বর্মণের যোগাযোগ ছিল। ললিতবাবু কুমিল্লায় এলে কামিনীবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করতেন। কামিনীবাবুও তাঁকে সবরকম সাহায্য করতেন। ললিতবাবুর নির্দেশে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে আগত আমরা সকলেই কামিনীবাবুর সঙ্গে পরিচিত হলাম, তাঁর সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও পেলাম। এখানে উল্লেখ করা যায় কুমিল্লায় আমাদের সব চেয়ে বড় সমর্থক ছিলেন কামিনীকুমার দত্ত। আমাদের প্রতিষ্ঠার পেছনে তার দান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি।

॥ সার্বজনীন সরস্বতী পূজা ॥

১৯২৮ সালে কুমিল্লায় এক সার্বজনীন সরস্বতী পূজোর আয়োজন করা হয়॥ আজকাল পাড়ায় পাড়ায় যে সার্বজনীন পূজা হয় তার মধ্যে অভিনবত্ব কিছু নেই। পাড়ার ছেলেদের গান বাজনা, আনন্দ উৎসবই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সেযুগে অব্রাহ্মণ চণ্ডাল নিয়ে পূজোর ব্যবস্থা করা মানে এক সামাজিক বিপ্লবের প্রবর্তন করা। সার্বজনীন পূজো মানে বর্ণভেদ বিলোপ ও অস্পৃশ্যতা বর্জন।

আমাদের এই সার্বজনীন পূজোরও মূল উদ্দেশ্য ছিল অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলন। কুমিল্লার বিখ্যাত মহেশ প্রাঙ্গণে হিন্দুসমাজের তথাকথিত অস্পৃশ্যদের নিয়ে পূজো ও অঞ্জলি দেবার ব্যবস্থা হল। পূজো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভ্যরা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এক আবেদন প্রচার করলেন, পূজোর দিনে মহেশ প্রাঙ্গণে পূজোয় ও অঞ্জলিতে যোগ দিয়ে অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলনকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য।

এই আবেদন পত্রে যাদের স্বাক্ষর ছিল তাঁদের মধ্যে কামিনী কুমার দত্ত, পরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ নৃপেন বসু, উকিল জিতেন্দ্র দত্ত, নিবারণ ঘোষ, ফনী নাগ, শরৎ ভৌমিক, প্রোফেসর জ্যোৎস্নাময় বসু,

প্রোফেসার নির্মল চৌধুরী, প্রোফেসার দিগিন্দ্র দত্ত, প্রোফেসার পরেশ চৌধুরী, অমর দাস, পুলিন গুপ্ত, মোহিত সেন, শরৎ ভৌমিক, অজিত দত্ত (কবিরাজ) প্রভৃতি প্রায় ত্রিশ জন।

এই আবেদন-পত্রে আমার স্বাক্ষরও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কুমিল্লার জনসাধারণের কাছে আমার প্রথম পরিচিতি।

এই সার্বজনীন পূজোর ব্যবস্থা শহরের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে খুব চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। যথাসময়ে বহুলোক সমাগমে পূজো, অঞ্জলি প্রদান, প্রসাদ বিতরণ ও উৎসব অনুষ্ঠিত হল। দিন কাল বিবেচনায় এর সাফল্য খুবই উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয়।

আমাদের এই সার্বজনীন সরস্বতী পূজোর খবর জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। আমাদের গ্রামেও আবেদন-পত্রটি পৌঁছেছিল। গ্রামের গোঁড়া পণ্ডিত সমাজ স্বভাবতঃই এই কাজ সমর্থন করেননি, ক্ষুব্ধও হয়েছিলেন। এই পূজো অনুষ্ঠানের পর আমি একদিন আমাদের গ্রামের দরিদ্র ভাণ্ডারের সভাপতি সুরেন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলার জন্য তাঁর ঘরে গিয়েছিলাম। পরে শুনলাম আমি চলে আসার পর সেই ঘরে যে জলের কলসীটি ছিল তার সব জল ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

॥ জন্মাষ্টমীর মিছিল ॥

এই সার্বজনীন পূজোর উদ্যোক্তারা স্থির করলেন কমাস পরে জন্মাষ্টমীর দিন ঢাকার বিখ্যাত জন্মাষ্টমীর মিছিলের মতোই কুমিল্লাতেও এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করতে হবে। এই বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন ডাঃ সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী, ডাঃ নৃপেন্দ্র বসু, অমর দাস, শরৎ ভৌমিক, উকিল জিতু দত্ত প্রভৃতি। অভয় আশ্রমের নেতৃবর্গের এতে বিশেষ উৎসাহ ছিল।

জন্মাষ্টমীর আগের দিন আমরা খবর পেলাম স্বার্থান্বেষীরা এই উপলক্ষ্যে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার ষড়যন্ত্র করছে। মফঃস্বল

থেকে যে সব শোভাযাত্রা শহরে আসবে সেগুলিকে মসজিদের কাছে মুসলমানরা বাধা দেবে। দিনটা ছিল শুক্রবার।

সেদিন বিকেলেই এক গোপন বৈঠকে আমরা মিলিত হলাম এবং স্থির হল যে শোভাযাত্রার উপর আঘাত করলে প্রত্যাঘাত করতে হবে, মার খেয়ে ছত্রভঙ্গ হওয়া চলবে না। লাঠিতে রঙিন কাগজের পতাকা লাগিয়ে তৈরি হয়ে পথে নামতে হবে। তাড়াতাড়ি রাত্রেই সকল কেন্দ্রে এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দেশ পাঠিয়ে দেয়া হল। স্বেচ্ছাসেবকরা শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য সেইভাবে প্রস্তুত হল।

জন্মাষ্টমীর দিন বিকেলে আমরা দলে দলে এসে জড় হলাম মহেশ প্রাঙ্গণে। নানা রকম সাজসজ্জা ও পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রীরা এল এবং যথা সময়ে মিছিল বার হল। কিন্তু একটু পরেই খবর এল যে অভয় আশ্রমের কাছে শোভাযাত্রীরা মুসলমান গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং মারামারিতে একজন মুসলমান নিহত ও উভয় পক্ষের কয়েকজন আহত হয়েছে।

পুলিসের কাছে এই খবর পৌছতেই এস. ডি. ও. নৃসিংহ মুখার্জী একদল পুলিস নিয়ে এসে আমাদের মিছিল বন্ধ করতে আদেশ দিলেন এবং ১৪৪ ধারা জারি করলেন। মিছিল তখন কুমিল্লা রেল স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল।

আমরা যারা মিছিলের পুরোভাগে ছিলাম তারা এই আদেশ অমান্য করাই স্থির করলাম। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন পরেশ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ নৃপেন বসু, ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী, জিতু দত্ত, বলাই ধর, অমর দাস, শরৎ ভৌমিক প্রভৃতি।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আমরা অগ্রসর হচ্ছি দেখে এস. ডি. ও. পরেশ চট্টোপাধ্যায়কে বল্লেন যে, তাঁর পরিচিতির সুযোগ নেওয়া হচ্ছে। জবাবে পরেশ বাবু বল্লেন, 'আপনার কর্তব্য আপনি করুন আমাদের কর্তব্য আমরা করছি, এতে পরিচিতির প্রশ্ন উঠে না।'

পুলিসদল এবার আমাদের পথ অবরোধ করে দাঁড়াল। সংঘাত

আসন্ন হয়ে উঠল। ঠিক এমনি সময় খবর এল যে, শহরের পূর্ব প্রান্তে রাজগঞ্জ বাজার এলাকায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে। তখন সরকারী বাধা অমান্য করে মিছিল পরিচালনা করার চেয়ে আমাদের দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য ছুটে যাওয়া উচিত বিবেচিত হল। মিছিল বন্ধ করে আমরা গেলাম দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায়। সেখানে পৌঁছে দেখি রাজগঞ্জ বাজারের কিছু দোকান লুঠ হয়েছে, দু'একজন খুনও হয়েছে। জীবন ব্যানার্জীর দাদাকে রক্তাক্ত দেহে পড়ে থাকতে দেখলাম।

॥ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ॥

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সন্ধ্যার পর দাঙ্গা আরও কয়েকটি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। আমরা নেমে পড়লাম ত্রাণ-কার্যে। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা থেকে হিন্দুদের সরিয়ে আনা এবং রাতে কুমিল্লা স্টেশন থেকে বহিরাগত যাত্রীরা যাতে অসতর্ক অবস্থায় দাঙ্গা অধ্যুষিত এলাকায় পৌঁছে বিপন্ন না হয়ে পড়ে তার ব্যবস্থা করল।

ত্রাণকার্যের জন্য কামিনীকুমার দত্ত ও মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মোটরগাড়ী এবং একটি লরীও যোগাড় হল। এই গাড়ীগুলি নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকেরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে দাঙ্গা প্রতিরোধের যাবতীয় ব্যবস্থা করতে লাগল।

জামতলা অঞ্চলে যে জায়গায় হিন্দুরা আক্রান্ত হয়েছিল, কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে আমি সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গেলাম। ঐ অঞ্চলের প্রভাবশালী ও বিখ্যাত ডাক্তার অবিনাশ ব্যানার্জীর বাড়ীর সামনে গিয়ে দেখি ঘাসের উপর প্রচুর তাজা রক্তে জায়গাটা লাল হয়ে গেছে। ডাঃ ব্যানার্জী চিকিৎসক হিসাবে মুসলমানদের মধ্যেও জনপ্রিয় ছিলেন।

শুনলাম সেদিন সন্ধ্যার পর কয়েকজন লোক এসে ডাক্তার বাবুর খোঁজ করে। কোন রোগী এসেছে ভেবে ডাক্তার বাবুর ভাই রমেশ

ব্যানার্জী দরজা খুলে বাইরে আসেন আর তক্ষুণি মুসলমান গুণ্ডারা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করে। রক্তাপ্লুত ক্ষতবিক্ষত দেহে হাসপাতালে নেবার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। অনুশীলন সমিতির সদস্য রমেশ ব্যানার্জী কুমিল্লার ডাকাতির ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯১৩ সালের ১২ই মার্চ সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

আমি যখন মাঝরাতে তাঁদের বাড়িতে বসে এই ঘটনার কথা শুনছি তখন একটি দশ বারো বছরের মেয়ে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, 'আমার কাকা কোথায়? কাকাকে এনে দাও!'

গভীর রাতে নিস্তব্ধতার মাঝে তার সেই করুণ কান্না আমাকে বিহ্বল করে তুলল। কি প্রবোধ দেব এই অবোধ বালিকাকে?

সঙ্গীদের নিয়ে যখন অন্যত্র যাবার জন্য বের হতে যাচ্ছি তখন সেই মেয়েটি আমার জামা ধরে বলে তার কাকা না এলে আমাকে যেতে দেবে না।

ভীত-সন্ত্রস্ত বালিকার এই সকাতর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারি না। সহকর্মীদের ছেড়ে দিয়ে সেই মেয়েটির কাছে সারারাত বসে রইলাম।

আজও যখন কুমিল্লার ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে তখনই কানে বাজে মেয়েটির সেই কাতর ক্রন্দন।

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও ত্রাণকার্য পরিচালনায় অনেকে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মনে পড়ে পরেশ চট্টোপাধ্যায়, সুরেন দাস, হেমেন্দ্র ভট্টাচার্য, ক্ষিতীশ ভৌমিক, সৌরীন পাল, কবিরাজ অজিত দত্ত, অমর দাস, বিনোদ ব্যানার্জী, চিত্ত দাশ প্রভৃতি ছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় কামিনীকুমার দত্তের কথা, যাঁর রান্নাঘর দিন রাত খোলা ছিল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জন্য।

অভয় আশ্রমের কয়েকজন নেতা ও কর্মীকে দাঙ্গায় প্ররোচনা

দেবার ও একজন মুসলমান হত্যার অভিযোগে পুলিস গ্রেপ্তার করে ও মামলা দায়ের করে। অহিংসায় বিশ্বাসীরা হিংসার অপরাধে অভিযুক্ত, তাই মামলাটি সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মহাত্মা গান্ধী রাজাগোপাল আচারীকে কুমিল্লা পাঠিয়েছিলেন এই ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য। শেষ পর্যন্ত প্রমাণ অভাবে সরকার পক্ষ মামলা উঠিয়ে নেওয়াই স্থির করে।

॥ পরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥

সার্বজনীন সরস্বতী পূজা ও জন্মাষ্টমীর মিছিল উপলক্ষ্যে শহরের গণমান্য কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তন্মধ্যে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য পরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসু।

পরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কলেজ বর্জন করেছিলেন। তিনি তখন কুমিল্লা কলেজের আই, এ, ক্লাশের ছাত্র ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে ছাত্ররা আবার ফিরে গেল যে যার স্কুল-কলেজে। কিন্তু পরেশবাবু কুমিল্লা কলেজে আর ফিরে গেলেন না। তিনি ভর্তি হলেন কলকাতায় ন্যাশনাল কলেজে।

১৯২০ সালে মহাত্মাগান্ধী ১১ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 'কলিকাতা বিদ্যাপীঠ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিভিন্ন প্রদেশের ছেলেরা এসে ভর্তি হয়েছিল বিদ্যাপীঠে, পরেশ চট্টোপাধ্যায় তন্মধ্যে একজন। কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, সহ-অধ্যক্ষ কিরণশঙ্কর রায়। আরও যাঁরা সেই কলেজে পড়াতেন তন্মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, টি, এল, ভাস্বানী, বিটল ভাই প্যাটেল। এতগুলো প্রতিভাশালী বিখ্যাত অধ্যাপকের পরিচালনায় বিদ্যাপীঠ ও ছাত্ররা গৌরবান্বিত হয়েছিল। দুঃখের বিষয় ঐ বিদ্যাপীঠ থেকে যাঁরা ডিগ্রী লাভ করেছিলেন তাঁদের আজও স্বীকৃতি দেয়নি স্বাধীন সরকার।

১৯২৩ সালে পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাপীঠ থেকে বি, এ, ডিগ্রী লাভ করে উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য গবেষণা করছিলেন উক্ত অধ্যাপকদের সহায়তায়। কিন্তু নানা কারণে গবেষণা শেষ করার আগেই তাঁকে কুমিল্লা চলে যেতে হয়।

বিদ্যাপীঠে পড়ার সময় তিনি সুভাষচন্দ্র বসুর খুব ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীকালেও সেই ঘনিষ্ঠতা বজায় ছিল। আমাদের বিরোধী দলভুক্ত এটা জেনেও সুভাষবাবু যখনই কুমিল্লা গেছেন তখনই সময় করে তাঁর প্রিয় ছাত্রের বাড়ীতে যেতেন। ১৯৩১ সালে সুভাষবাবু তাঁর সাহায্যে কুমিল্লায় কংগ্রেসের আভ্যন্তরীন বিরোধ মেটাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯২৬ সালে পরেশবাবু ফিরে এলেন কুমিল্লায়। ১৯২৮ সালে সার্বজনীন সরস্বতী পূজা ও জন্মাষ্টমীর মিছিলের তিনি একজন উৎসাহী উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সময় আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

পরেশবাবুর বাবা বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বিশিষ্ট আইন ব্যবসায়ী ও কংগ্রেসের সমর্থক। বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতিও তাঁর সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল। ফলে তাঁর বাড়ীটি অনুশীলন সমিতির একটি বড় কেন্দ্র ছিল। বাড়ীতে তাঁর দুই ছেলে পরেশচন্দ্র ও শৈলেশচন্দ্র এবং আত্মীয় সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তাঁরই আত্মীয় খ্যাতনামা বিপ্লবী বীরেন চ্যাটার্জী ও যোগেশ চ্যাটার্জী। তাঁর বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করত এমন কয়েকজন ছাত্রও অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিল। এ সব খবর জানার পর পরেশবাবুর বাড়ী যেতে ও তাঁর সঙ্গে চলাফেরা করতে আমার সংশয় ও ভয় ছিল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে তার কথাবার্তা ও ব্যবহারে আমার সে সঙ্কোচ কেটে গেল। বরং বেশ ভালই লাগত তাঁর বাড়ী গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে যখনই যেতাম (শুধু আমি কেন যে কোন লোক গেলেই) সুস্বাদু বিস্কুট আর চা সহযোগে গল্প জমত বেশ। রাজনৈতিক মতামত সম্পর্কে তাঁর উদার

দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি প্রচুর পড়াশোনা করতেন, দোতালায় তাঁর শোবার ঘরে গেলে বই-এর সমাবেশ দেখে বুঝতে অসুবিধা হত না যে লোকটি জ্ঞানপিপাসু। নানাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বোধ হয় তিনি বেশী পড়তেন।

যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমরা কুমিল্লায় আলাদা সংগঠন গড়ছি তিনি ক্ষুব্ধ হলেন না বরং আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ক্রমে বন্ধুদের সঙ্গে এবং আমাদের নেতা ললিতমোহন বর্মণের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হল, আলাপ আলোচনা হল। পরেশবাবুর সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা করে তাঁর পাণ্ডিত্য ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি দেখে ললিতমোহন বর্মণও খুবই মুগ্ধ হলেন। পরেশবাবু ও ললিতবাবুর পাণ্ডিত্যে ও ব্যবহারে আকৃষ্ট হলেন। আমাদের দলের অনেকের সঙ্গেই পরেশবাবুর পরিচয় ও ভাল সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফলে আমরা তাঁকে আমাদের আয়োজিত ত্রিপুরা যুব সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তাঁর দলের আপত্তিতে তিনি আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নি। তবু এই উদারচেতা বিপ্লবীর প্রতি আমাদের দলের সকলের শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর সাহচর্যে আমাদের কাজের অনেক সুবিধে হয়েছিল এটা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করতে হয়।

শ্রীপরেশ চট্টোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম। আজও মনে পড়ে অনেক ছোট ছোট ঘটনার কথা, তার মধ্যে দু' একটি উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

এক বিকেলে দুজনে বেড়াতে গেলাম কুমিল্লার ঘোড়দৌড়ের মাঠে। হঠাৎ এসে গেল ঝড়-বৃষ্টি। আমি বাড়ী ফেরার কথা তুলতে তিনি বল্লেন—ঝড়-বৃষ্টিকে ভয় করলে চলবে কেন? শরীরটাকে শক্ত না করলে দেশের কাজ করবে কি করে? বেশী নিয়ম করে না চলে অনিয়মকে নিয়ম করে নাও। তারপর চুপ করে বৃষ্টিতে ভিজে জবজবে হলাম দুজনই।

একদিন সন্ধ্যায় তিনি এলেন আমাদের বাসায় সাইকেল চড়ে। তাঁর খুব লোভনীয় ও আকর্ষণীয় রেলীর সাইকেল ও একটি ক্যামেরা ছিল। এটা তখনকার কুমিল্লায় উচ্চ সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হলেও তাঁর ব্যবহারে কিছুই প্রকাশ পেত না। তিনি আমাদের ঘরে ঢুকতেই দেখলাম তাঁর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। তক্ষুনি আমরা ওষুধ ও জল নিয়ে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

তিনি বাধা দিয়ে বল্লেন—ফুটবল খেলে এলাম, নাকে বল লেগেছে কিছুই আনতে হবে না, তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে না। পরনের খদ্দরের ধুতি দিয়ে রক্ত মুছে খোশ গল্প শুরু করে দিলেন। যাবার সময় বলে গেলেন—খেলবে অথচ ব্যথা পাবে না তা কি হয়?

এখানে মনে পড়ে আমার সাইকেলটির কথা। একেবারে হতশ্রী সাইকেল। দুটো চাকা ছাড়া তার কোন অঙ্গই নিখুত নয়। তবু ছিল আমার সর্বক্ষণের সাথী, আমাকে যারা চিনত তারা আমার মার্কামারা সাইকেলটিকেও চিনত। আত্মগোপন করার আগে সেটিকে রেখেছিলাম সুরেন ঘোষের সাইকেলের দোকানে। পুলিস চিনতে পেরে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছিল আমার পরিবর্তে আমার সাইকেলটিকে।

শ্রীপরেশ চট্টোপাধ্যায় শহরের কিশোরবাহিনীর খুব প্রিয় ছিলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁর জমজমাট আসর বেশ উপভোগ্য ছিল। আসর জমাবার জন্য তাঁর বড় উপকরণ ছিল লজেন্স। ছোটদের প্রিয় ও লোভনীয় এই বস্তুটির প্রতি তাঁর নিজের আকর্ষণও কম ছিল না, কান্দিরপাড়ের চক্রবর্তী ব্রাদার্স দোকানে লজেন্স বোধ হয় তাঁর জন্যই রাখা হত। লজেন্সের আকর্ষণে ছোটরা তাঁকে ঘিরে থাকত। হাসিমুখে তাদের আবদার মেটাতেও তিনি ভালবাসতেন। কখনও বিরক্ত হতেন না, রাগ করতেন না। কোন বাড়ীতে গেলে প্রথম তিনি খোঁজ করতেন ছোটদের। তাদের নিয়ে বেড়াতে যেতে, খোশ গল্প করতে তাঁর সময়ের অভাব হত না, ক্লান্তি আসত না। আর একটি মজার ব্যাপার ছিল—তিনি

ছিলেন কুমিল্লায় অনেকের 'পরেশদা'। ছোট-বড়, পিতাপুত্র সকলেরই তিনি 'পরেশদা'।

কুমিল্লায় আমার হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন—পরেশ চট্টোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ নন্দী। দুজনের প্রকৃতি ছিল দু'রকম। পরেশবাবুকে দেখলেই ছোটরা লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসত, কিন্তু প্রমথবাবুর কাছে ছোটরা ঘেঁষতে চাইত না। খুব কড়া মেজাজের লোক ছিলেন প্রমথবাবু।

মজার ঘটনা একটা মনে পড়ছে। ১৯২৯ সালে আমরা যাচ্ছি কিশোরগঞ্জ। প্রমথবাবুর বিয়ে, আমরা কজন বরযাত্রী। বরকর্তা তাঁর জ্যেঠামশাই রজনীনাথ নন্দী। ভৈরব স্টেশনে গাড়ী বদলাবার সময় বরকর্তার শোবার জায়গা নিয়ে রেলগার্ড কি একটা আপত্তিকর কথা বলেছিলেন। কথাটা হজম করতে পারলেন না প্রমথবাবু। মেরে বসলেন এক থাপ্পড়। রেলকর্মচারীর উপর বলপ্রয়োগ! পুলিস এল, গ্রেপ্তার করল বরকে। বরছাড়া বরযাত্রী অকল্পনীয়! এখন কি হবে? আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম।

বরকর্তা রজনীনাথ ছিলেন রেলেরই উকিল। তখন তিনি আসরে নামলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে জামিনে মুক্ত করে আনলেন বরকে। শেষপর্যন্ত আমরা পৌঁছে গেলাম কিশোরগঞ্জে, বিয়েও সুসম্পন্ন হল।

পরেশবাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার কথা পুলিসও জানত। যদিও তিনি আমাদের দলের কর্মী নন, তবু আমার জন্য তাঁকে পুলিস গ্রেপ্তার করতে পারে আশঙ্কায় স্টিভেন্স হত্যার কয়েকদিন আগেই আমি তাঁকে বলেছিলাম শহর ছেড়ে চলে যেতে। তিনি চলেও গিয়েছিলেন, তবু অনেক দিন পুলিস তাকে উৎপীড়ন করেছিল।

অভয় আশ্রমের ডাঃ নৃপেন বসুও ছিলেন সকলের প্রিয় এবং সর্বসাধারণের "নৃপেনদা"। অমায়িক, সরল ও দরদী ব্যবহারে মোহগ্রস্ত করে ফেলতেন রুগীকে। চিকিৎসার চেয়ে তাঁর সহৃদয় ব্যবহার ও সহানুভূতিসূচক কথাবার্তায়ই রুগীর অসুখ অর্ধেক সেরে যেত আর বাকীটা সারত ওষুধের ফলে।

১৯২৮ সালে বাবার মৃত্যুর পর আমি ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হলাম। গ্রামে চিকিৎসায় রোগ সারল না, এলাম এই নৃপেনদার কাছে। সুস্থ হলাম তাঁর চিকিৎসায়। কুমিল্লায় দুরারোগ্য ব্যাধির ও মুমূর্ষু রুগীর রক্ষাকর্তা ছিলেন তিনি। বহুবছর তাঁর সাহচর্য লাভ করেছি। কোনদিন দেখিনি তাকে ধৈর্য হারাতে। সব সময় হাসিটি লেগে থাকত তাঁর মুখে। অভয় আশ্রমের জন্য তাঁর উপার্জিত সকল অর্থ ব্যয় হত। তিনি নিজে খুব সাধারণ জীবন যাপন করতেন। অভয় আশ্রমের সংগঠনে তাঁর দান অতুলনীয়। তার ত্যাগ নিরলস কর্মজীবন আদর্শ স্থানীয় ও অনুকরণীয়। স্টিভেন্স হত্যার পর আমরা যখন কুমিল্লা জেলে বিচরাধীন, নৃপেনদা আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য ধৃত হয়ে আমাদের ওয়ার্ডেই এলেন। তাঁর উপস্থিতিতে আমাদের কারাজীবন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি প্রত্যেকের শুধু স্বাস্থ্য নয়, খাওয়া-দাওয়া ও সকল বিষয়ে যত্ন নিতেন। কিভাবে বিছানাটি গোছাতে হবে, কিভাবে মশারিটি ভাঁজ করতে হবে সব খুঁটিনাটি লক্ষ্য করে উপদেশ দিতেন। নিজে করেও দেখাতেন।

॥ শৈলেশ চট্টোপাধ্যায় ॥

পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৈলেশ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অনুশীলন সমিতির একজন সক্রিয় ও বিশিষ্ট সভ্য, ছাত্রনেতা; খেলাধুলা, পড়াশোনা, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কুচকাওয়াজ প্রভৃতি ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অগ্রণী ও কৃতকর্মা। কুমিল্লা কলেজের প্রিয়ছাত্র শৈলেশকেও গ্রেপ্তার করল ১৯৩১ সালের নভেম্বর মাসে অন্যান্য নেতৃবর্গের সাথে বেঙ্গল অর্ডিনান্সে। কুমিল্লা জেল থেকে নিয়ে রাখল হিজলী ক্যাম্পে।

হিজলী ক্যাম্পেও শৈলেশ তাঁর কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠা করে দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠল। সেখানেও তাঁকে বেশীদিন রাখা নিরাপদ নয় মনে করে গভর্নমেণ্ট সুদূর মরুভূমির সন্নিকটস্থ

দেউলি ক্যাম্পে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করল। ম্যালেরিয়ায় তখন শৈলেশ ভুগছিল। তাই দেউলি স্থানান্তরের আদেশটি রদ করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করল। যথারীতি সে আবেদন অগ্রাহ্য হল। ১৯৩২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর শৈলেশকে দেউলি পাঠান হল।

বন্দী শিবিরে শৈলেশ ব. এ. পাস করে এম. এ. ও ল. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

দেউলিতে তাঁকে রাখা হয়েছিল তিন নম্বর ক্যাম্পে। কিছুদিনের মধ্যেই ক্যাম্পের খেলাধূলা পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। স্পোর্টস সেক্রেটারী হয়ে গেলেন। ক্যাম্পের সকল ডেটিনিউই তাঁকে ভালবাসত, প্রশংসা করত। তাঁর আচার-ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু দেউলির আবহাওয়াটা তাঁর স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না। হঠাৎ একদিন শৈলেশ আক্রান্ত হল সাংঘাতিক ধরনের ম্যালেরিয়ায়। ক্যাম্পের হাসপাতালে নিয়ে গেল চিকিৎসার জন্য। সেখানে মেডিকেল অফিসার ডাঃ খাঁন অতিরিক্ত পরিমাণ কুইনাইন ইনজেক্‌শন দিয়ে তার ফলাফল দেখার জন্য অপেক্ষা না করেই হাসপাতাল ছেড়ে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর অতিরিক্ত ওষুধের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কিন্তু তখন ডাক্তারকে খুঁজে পাওয়া গেল না, প্রতিক্রিয়া নিবারণের কোন চিকিৎসাই সম্ভব হল না। একুশ বছরের সুশ্রী সবল দেহটি চিরতরে শীতল হয়ে গেল। সারা দেউলি ক্যাম্প নিস্তব্ধ হয়ে গেল। দিনটি ছিল ১৭ই অক্টোবর ১৯৩৩ সাল।

ডাক্তারের অবহেলা ও অসতর্কতার বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট।

আমাদের দাবীর ফলে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্য শৈলেশের শীতল দেহটি বিভিন্ন ক্যাম্পে নিয়ে এসেছিল কর্তৃপক্ষ।

পরে প্রায় একই ধরনের ম্যালেরিয়ায় ঐ ক্যাম্পেই আক্রান্ত হয়েছিলেন ত্রিদিব চৌধুরী। কিন্তু ডাক্তারের সতর্ক চিকিৎসায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

—তিন—

সার্বজনীন সরস্বতী পূজো, জন্মাষ্টমী মিছিল এসব প্রকাশ্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম আমাদের গুপ্ত সংগঠনের প্রয়োজনেই। জনসাধারণের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে আমাদের কাজের নানা সুযোগ পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এসে আমাদের পার্টির আরও কয়েকজন সভ্য কুমিল্লা কলেজে ভর্তি হল। তার মধ্যে ছিল নৃপেন্দ্রচন্দ্র পাল, অপূর্ব কাঞ্চন দত্ত, বীরেন্দ্র দত্ত গুপ্ত, বিনয় দত্ত, প্রমথ চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্র চক্রবর্তী। কর্মীর সংখ্যা বেড়ে গেল। শহরের বিভিন্ন এলাকায় পার্টির সদস্য ও সমর্থক সংগ্রহ করতে এবং কেন্দ্র স্থাপন করতেও সক্ষম হলাম আমরা।

॥ শক্তিসংঘ ॥

১৯২৮ সালে আমাদের মেলামেশা ও আলোচনার সুবিধার জন্য তালপুকুর পাড়ে 'শক্তিসংঘ' নামে একটি আখড়া স্থাপিত হল। কুমিল্লায় এটাই আমাদের প্রথম প্রকাশ্য সংস্থা। এখানে প্রধানতঃ ব্যায়াম শেখাবার ব্যবস্থা হল। ব্যায়াম শেখাতেন প্রখ্যাত ব্যায়াম শিক্ষক বিমলা দাস। প্রতিদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে আগত পার্টি সদস্য সকলেই এখানে ব্যায়াম করার জন্য সমবেত হত। পাড়ার অনেক ছেলেও এই আখড়ায় যোগ দিয়েছিল।

॥ যুবসম্মেলন ॥

ইতিমধ্যে কুমিল্লায় আমরা কিছুটা সংগঠিত হয়েছি, পরিচিতি লাভ করেছি, অনেক সমর্থকও পেয়েছি। তাই দলনেতা ললিতমোহন বর্মণ নির্দেশ দিলেন কুমিল্লায় ত্রিপুরা জেলা যুবসম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন আহ্বান করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে।

১৯২৭ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যুবসম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভাপতি হয়েছিলেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ঢাকা থেকে বিপ্লবী-নেতা অনিল রায় ও নিকুঞ্জ সেন এ সময় এসে পার্টির কাজকর্ম সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেছিলেন ললিত বর্মণের সাথে, মিলিত হয়েছিলেন পার্টির সক্রিয় কর্মীদের সঙ্গে।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ত্রিপুরা জেলা যুবসম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে এলেন বিপ্লবী নেতা পূর্ণ দাস। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি প্রথমে মনোনীত হয়েছিলেন পরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করায় মনোনয়ন দেওয়া হল ঈশ্বর পাঠশালার শিক্ষক রাসমোহন চক্রবর্তীকে। রাসমোহনবাবু কুমিল্লার অত্যন্ত সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। তাঁর সমর্থন আমাদের সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে অনেক সাহায্য করেছিল। সম্মেলনের সাফল্যের জন্য বিশেষ ভাবে আমরা ঋণী শ্রদ্ধেয় কংগ্রেস নেতা বসন্ত কুমার মজুমদার ও হেমপ্রভা মজুমদারের নিকট। এই মজুমদার দম্পতি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন সম্মেলনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য।

বিপ্লবীনেতা পূর্ণ দাসের সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর সহকর্মী সুসাহিত্যিক বিপ্লবী অমলেন্দু দাশগুপ্ত।

পূর্ণ দাস সভাপতির ভাষণে যুবসমাজকে এক নূতন মন্ত্র নেবার আহ্বান জানালেন—"Organisation, Audacity and Death" (সংগঠন, দুঃসাহস ও মৃত্যু) এবং বীজমন্ত্র হল 'Liberty' (স্বাধীনতা)।

ছাত্র ও যুব মনে এই আহ্বান এক অপূর্ব প্রেরণা সৃষ্টি করল। প্রতিপক্ষ সম্মেলনকে পণ্ড করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। তবু ছাত্র ও যুব সমাজ দলে দলে যোগদান করায় সফল হল সম্মেলন।

সম্মেলন শেষ হবার পর আমাদের সমর্থকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আমরা আরও দুটি আখড়া স্থাপন করলাম। আখড়াগুলোতে ছেলেদের আকর্ষণ করার জন্য লাইব্রেরীও ছিল। যে সব ছেলে

আখড়ায় এসেছিল তাদের মধ্যে ভাল ছেলেদের পার্টির সভ্য করে নেওয়া হত। এইসব আখড়াগুলোকে জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় করেছিল নরেশ (হাবুল) ব্যানার্জী ও গোবিন্দ সাহা। দুজনই ব্যায়ামবীর। হাবুলের বুকের উপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে নেবার প্রদর্শনী দেখার জন্য প্রচুর লোক সমাগম হত। হাবুলের জনপ্রিয়তা দেখে তাকে রিক্রুট করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলাম, অনেক দিন আলোচনা করে তাকে দলভুক্ত করার ফলে আমাদের সংগঠন খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে তার পাড়ার আরও কয়েকটি ছেলে অজিত গুহ, শান্তি গুহ প্রভৃতি আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। আখড়াগুলোকে জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় করার জন্য গোবিন্দ সাহার অবদানও ছিল যথেষ্ট। গোবিন্দ সাহার সুঠাম দেহ ও ব্যায়াম প্রদর্শনী দেখার জন্য যথেষ্ট লোক জড় হত।

কুমিল্লায় আখড়া স্থাপনে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করার পর আমরা কুমিল্লার নিকটবর্তী কসবা ও কুঠিতে আখড়া স্থাপন করলাম, এই কুঠির আখড়াতেই যোগ দিয়েছিলেন শহীদ অসিত রঞ্জন ভট্টাচার্য।

আমাদের আখড়া স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই ললিতমোহন বর্মণ এসে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের সাহায্যে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে ছাত্র ও যুবকদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তুলে বিপ্লবী দলে যোগ দেবার পথ প্রশস্ত করে দিতেন। যুবসম্মেলনের পরেই তিনি মহেশ প্রাঙ্গণে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়ে শহরের লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেন। তাঁর বক্তৃতা ও পাণ্ডিত্য কুমিল্লার বুদ্ধিজীবিদের মুগ্ধ করেছিল।

কসবা ও কুঠির আখড়া দুটি কুমিল্লা থেকেই পরিচালিত হত। আমরা পালা করে প্রতি শনিবার সেখানে যেতাম ছোরাখেলা, লাঠিখেলা শেখাতে এবং দেশের অবস্থা ও বিপ্লবী আন্দোলনের গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করত।

কুমিল্লায় আমাদের আর একটি শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল 'সন্তান সংঘ'। বসন্ত মজুমদারের বাড়ীতে এটি স্থাপিত হয় এবং পরিচালনার ভার ছিল ননী মজুমদার, হেরম্ব চক্রবর্তী ও সুখেন্দু সেনগুপ্তের উপরে। সেখানে ব্যায়ামাগারের সঙ্গে একটি ভাল গ্রন্থাগারও ছিল। এই সংঘের উন্নতির জন্য আন্তরিক চেষ্টা করতেন বসন্ত মজুমদার ও হেমপ্রভা মজুমদার, তাঁদের পুত্র ননী মজুমদার ও কন্যা অরুণা মজুমদার। হেমপ্রভা মজুমদার তখনকার দিনে খুব জনপ্রিয় মহিলা বক্তা ছিলেন, তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য শহরে বা গ্রামে প্রচুর জনসমাগম হত। বসন্ত মজুমদার ও হেমপ্রভা মজুমদার স্বামী-স্ত্রী। একসঙ্গে আজীবন কংগ্রেসের কাজ করেছেন, পুলিসের অত্যাচার সহ্য করেছেন, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, জেল খেটেছেন। পরবর্তীকালে হেমপ্রভা মজুমদার বঙ্গীয় বিধান সভার সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই মজুমদার পরিবারের সমর্থন ও সাহায্য আমাদের সংগঠন গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

আমরা যেখানেই ব্যায়াম চর্চার জন্য আখড়া স্থাপন করতাম সেখানে তার সঙ্গে একটি গ্রন্থাগার ও রাখা হত। পড়াশোনার উপর আমাদের বিশেষ নজর ছিল। স্কুল বা কলেজের পড়াশোনায় যারা ভাল, তাদেরই রিক্রুট করার জন্য আমরা প্রলুব্ধ হতাম। তাদের দেশভক্তি ও নীতিবোধ বাড়াবার জন্য সকল রকম চেষ্টা হত। দলের সদস্যদের অবশ্য পাঠ্য ছিল গীতা, স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থ, আনন্দ মঠ, দেশের কথা, পথের দাবী, ডি, ভ্যালেরা, ম্যাকস্থইনি গ্যারিবল্ডীর জীবনী ও তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, নজরুল, ডি. এল. রায়ের দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। নিষিদ্ধ ছিল ধূমপান, উপন্যাস ও ডিটেক্‌টিভ বই পড়া। সাধারণ জীবন যাপন ও সবরকম বিলাসিতা বর্জন আমাদের লক্ষ্য ছিল। আমাদের ব্রত ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সবরকম স্বার্থত্যাগ ও সকল অত্যাচার সহ্য করার প্রস্তুতি।

বাছাই করা ভাল ছেলে পাবার আমাদের একটা বড় সুযোগ মিলে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে স্বামী স্বরূপানন্দ যুবকদের চরিত্রগঠন ও ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য নানাভাবে অনুপ্রাণিত করছিলেন। স্থানীয় ভাল ছাত্ররা প্রায় সকলেই তাঁর অনুগামী হয়েছিল। ১৯২৫ সালে আমার সাথেও তাঁর যোগাযোগ হয়। আমাদের দলের কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্য স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে চরিত্রবান ছেলেদের বাছাই করে দলভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল।

স্বামীজীর শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা আমাদের পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নীরদ চক্রবর্তী, প্রমথ চক্রবর্তী, ভুপেশ বর্মন, মাখন চক্রবর্তী, ব্রজেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি।

স্বামী স্বরূপানন্দের উপদেশ ও সাহচর্যে আমরা লাভবান হয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের জন্য তিনি বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন। কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার পর আমাদের সঙ্গে তাঁর যোগ আছে সন্দেহ করে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ও কুমিল্লা জেলে কিছুদিন আটক রাখে। সরকার এমন একজন ধর্মপ্রাণ সন্ন্যাসীকে অনর্থক উৎপীড়ন করায় আমরা খুবই দুঃখিত হয়েছিলাম। সুখের বিষয় স্বামীজী বর্তমানে একজন মহাপুরুষরূপে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন, দেশের বিভিন্ন স্থানের হাজার হাজার লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন, বহু জায়গায় তাঁর আশ্রমও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সেসময় আমাদের বিভিন্ন আখড়া, সমিতি ও দলের কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন বঙ্কিম চক্রবর্তী, রবীন্দ্র গোস্বামী, ননী রায়, নরেশ (হাবুল) ব্যানার্জী, অসিত গুহ, বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত, নৃপেন সেনগুপ্ত, সত্যব্রত সেনগুপ্ত, সুধীর ব্রহ্ম, লোকেন সেনগুপ্ত, মণীন্দ্র দাস, বিশ্বরঞ্জন মজুমদার, বিদ্যাধর সাহা, নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য, চন্দ্রকিশোর সরকার, মণীন্দ্রলাল রায় চৌধুরী, অজিত গুহ, অমূল্যকাঞ্চন দত্তরায়, অপূর্বকাঞ্চন দত্তরায়, সুশীল বর্মণ, ভূবন বর্ধণ, সুধাংশু ভট্টাচার্য।

॥ ছাত্র সংঘ ॥

১৯২৬ সালে কলিকাতায় ছাত্রদের মধ্যে দুটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছিল। একটি ABSA (অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন) অপরটি BPSA (বেঙ্গল প্রভিন্সিয়েল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন)। প্রথমটি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং অন্যটি সুভাষচন্দ্র বসুকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল।

সুভাষ বাবু যুগান্তর বিপ্লবী দলকে সমর্থন করতেন। তার সমর্থনে আমরাও কুমিল্লার BPSA-এর এক শাখা গঠন করলাম। ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হল ত্রিপুরা জেলা ছাত্র সংঘ। আমি নির্বাচিত হলাম প্রেসিডেন্ট আর শৈলেন্দ্র চৌধুরী সেক্রেটারী।

কুমিল্লায় জিলা ছাত্র সংঘ গঠন করার পর আমরা বিভিন্ন শহর ও গ্রামে তার শাখা গঠন করার ব্যবস্থা করলাম। গ্রামে গিয়ে সভা-সমিতি করে ছাত্রদের সংগঠিত করা হত। এ সব সভায় আমাদের ভুবনবিহারী বর্ধণের বক্তৃতা খুবই কার্যকরী হত। এইভাবে চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রভৃতি শহর ও কয়েকটি গ্রামে ছাত্র সংঘের শাখা স্থাপিত হয়।

এই সময়ে আমরা কুমিল্লায় একটি প্রভাবশালী সমিতির সমর্থন লাভ করলাম। সমিতিটির নাম 'ছাত্র সমাজ'। ছাত্র সমাজের নেতা সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস ললিতমোহন বর্মণের সঙ্গে কয়েকদিন আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁর নেতৃত্বে গঠিত ও পরিচালিত ছাত্র সমাজের সকল কর্মীরাই আমাদের বিপ্লবী দলে যোগ দেবেন। এই সমিতিতে কয়েকজন একনিষ্ঠ কর্মঠ সভ্য ছিল। আমাদের সঙ্গে তাদের মিলনের ফলে আমরা কুমিল্লায় বেশ শক্তিশালী হলাম, আমাদের সামর্থ বেড়ে গেল। এ ভাবে যাঁরা আমাদের দলে এলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হেমেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুবোধ মুখার্জী, শিশির চৌধুরী, জীবন ব্যানার্জী, রতি দে, অজিত সেন, রামকৃষ্ণ গুপ্ত। ললিত বাবু সুরেন বাবুর সঙ্গে আলোচনা করে ও কাজকর্ম দেখে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন

যে পরবর্তীকালে তাঁর অনুপস্থিতিতে সুরেন দাসকেই দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

আগরতলার বিশিষ্ট সমাজ সেবী মণি বিশ্বাস আমাদের সংগঠনের কর্মশীলতার কথা শুনলেন নির্মলেন্দু ভট্টাচার্যের কাছে। আমাদের দলের উদ্দেশ্যে ও প্রোগ্রাম জানবার জন্য তিনি এলেন কুমিল্লায়। একদিন আলোচনা করতে এলেন আমার বাসায়। তাঁর সঙ্গে আলোচনা যখন শেষ হল তখন ঘরের বাইরে এসে দেখি ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আমরা এতই মগ্ন ছিলাম যে কখন রাত শেষ হয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি। তিনি আমাদের আখড়া, লাইব্রেরী সব দেখলেন, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কথা বল্লেন এবং রাজী হলেন আমাদের পার্টিতে যোগ দিতে।

মণি বিশ্বাসের অক্লান্ত চেষ্টায় ও উদ্যোগে আগরতলায় আমাদের দলের একটি শাখা গঠিত হল। এই কেন্দ্রের সদস্য প্রবোধ চক্রবর্তী ও কামিনী দে শ্রীহট্টে একটি ডাকাতি করার পরিকল্পনা নিয়ে যাবার পথে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিকটবর্তী ভাদুগড়ে পুলিস কর্তৃক ধৃত হয় ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে। তাদের সঙ্গে তিনটি রিভলভার ছিল কিন্তু গুলি ছুড়বার আগেইধরাপড়ে যায়। পুলিশ দুজনের উপরেই অমানুষিক অত্যাচার করে। কামিনী দের হাতের নখের গোড়ায় সূঁচ ফুটিয়ে দিয়েছিল, তবু সে একটি কথাও প্রকাশ করেনি। কামিনী দে ছিল মণি বিশ্বাসের কারখানার সাধারণ কর্মচারী। পুলিস ভেবেছিল প্রলোভন দেখিয়ে ও অত্যাচার করে এই নিরীহ ব্যক্তিটির স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারবে। কিন্তু তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ২৫শে জুন ১৯৩২ প্রত্যেকের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয় এবং দুজনেই আন্দামানে প্রেরিত হয়। চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের পর পলাতক বিপ্লবীদের অনেক সাহায্য করেছিল এই কেন্দ্রের সদস্যরা। কেন্দ্রের নেতা মণি বাবু অর্ডিনান্সে বহু বছর বন্দী ছিলেন।

ঢাকায় বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও কামাখ্যা চক্রবর্তী ন্যাশানেল

মেডিকেল স্কুলের ছাত্র। তাদের উপর দায়িত্ব ছিল শ্রীসংঘের সাহায্যে ও যোগাযোগে কাজ করার। বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য সেখানে যাদের দলভুক্ত করেন তার মধ্যে ছিল বরিশালের অন্নদা দাস। অন্নদা দাসের মারফতে তিনি বরিশালে ও একটি কেন্দ্র গঠন করেছিলেন। বরিশাল কেন্দ্রের ইন্দু চক্রবর্তী ও অন্নদা দাসকে ১৯৩১ সালের নভেম্বর মাসে স্টিভেন্স হত্যার পূর্বে কুমিল্লায় আনা হয়। কুমিল্লার পুলিসের নিকট তারা দুজনেই অপরিচিত। তাই তাদের উপর ভার রইল বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের গোপন আস্তানা আগলাবার ও অন্যান্য গোপন কাজ করার।

কলকাতায় রেবতী বর্মণ ও ফকির রায়ের চেষ্টায় আমাদের পার্টির শাখা বেশ সক্রিয় ছিল। কুমিল্লা কলেজ থেকে আই. এ. পাস করে নৃপেন পাল কলিকাতায় পড়তে যায় এবং ত্রিপুরা ছাত্র সংঘের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনে কাজ করতে থাকে। আমাদের পার্টির কাজেও তার বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। কলকাতায় পার্টির অন্যান্য সক্রিয় সদস্যের মধ্যে ছিলেন জীতেন ঘোষ, সমর পাল, প্রদ্যোত ঘোষ, পবিত্র দেব, ঊষা পাল, কৃষ্ণানন্দ দত্ত, হেমরঞ্জন দেব, সুধীন্দ্র দেব, শরৎচন্দ্র চৌধুরী, অনিল বর্মণ প্রভৃতি।

১৯২৯ সাল। আই. এস্‌সি. পাস করেছি। কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত ডাক্তারী পড়ার জন্য ঢাকা যাওয়া আর সম্ভব হল না। পার্টির কাজ আমাকে কুমিল্লাতেই আটকে রাখল। কুমিল্লা কলেজেই বি. এ. পড়ার জন্য ভর্তি হয়ে গেলাম।

আমাদের প্রকাশ্য ও গোপন কাজ বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। যদিও বাধা বিপত্তির অভাব ছিল না। শক্তিশালী প্রতিপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট ছিল আমাদের অগ্রগতি রোধ করতে। আক্রমণ সইতে হয়েছিল অনেক।

একদল অন্য দলকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টার মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। দলাদলিটা বাঙ্গালীর চিরন্তন মজ্জাগত ব্যাধি। দলাদলি করে শক্তিক্ষয় করতে আমরা বেশ পটু।

প্রাচীন কালে সামাজিক ব্যাপার নিয়ে দলাদলি হত। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকদের প্রতিপক্ষের তীব্র আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

১৯০৫ সাল থেকে রাজনৈতিক দলাদলি দেখা দিল। সুরেন ব্যানার্জী—বিপিন পাল, দেশবন্ধু—শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সেনগুপ্ত—সুভাষ, তাঁদের ঘিরে দলাদলি সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

পূর্বে দলাদলি চরিতার্থ করার জন্য একে অপরের সভা-সমিতি বন্ধ করত, তারজন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করত। হৈ চৈ, ঢিল ছোঁড়াছুড়ি হত। কিন্তু দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই আক্রমণের পদ্ধতিরও অনেক উন্নতি হয়েছে। আজকাল তো বোমা, পাইপগান, রিভলভার হামেশাই ব্যবহৃত হচ্ছে।

ত্রিশের দশকে কুমিল্লায় আমাদের দলাদলি এত উন্নত ছিল না। তখন ব্যবহৃত হত প্রধানতঃ লোহার ডাণ্ডা এবং লক্ষ্য মাথাটি। আমাকে তখনকার কুমিল্লা কলেজের প্রিন্সিপাল রাধাগোবিন্দ নাথ জিজ্ঞেস করেছিলেন, শরীরে এত জায়গা থাকতে শুধু মাথাটিই লক্ষ্য কেন?

সত্যি বিস্ময়ের বিষয়। তবে এটা ছিল সে যুগের একটা বিশেষ কৌশল—Strategy। এ কৌশলের প্রধান অঙ্গ ছিল ডাণ্ডাটিকে লুকিয়ে রাখার কায়দা। যাঁর উপর দায়িত্ব পড়ত ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করার তিনি পাঞ্জাবী পরতেন এবং ডান হাতে ডাণ্ডাটি ধরে পাঞ্জাবীর হাতের ভিতরে সেটা লুকিয়ে রেখে নিরীহ ভদ্রলোকের মত চলাফেরা করতেন। সাধারণতঃ প্রায় দুহাত লম্বা লোহার ডাণ্ডা ব্যবহৃত হত।

এমনি ভাবে একটি নিরীহ ছেলে আমাকে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিল। ১৯৩০ সালের জুন মাসে একদিন বেলা এগারোটার সময় জনবহুল কান্দিরপার চৌমাথায় আমি সাইকেল চড়ে যাচ্ছি, হঠাৎ একটি নিরীহ ব্যক্তি লোহার ডাণ্ডাটি বার করে আমার মাথাটি লক্ষ্য করে আঘাত করল। সাইকেলে যাচ্ছিলাম তাই মুণ্ডটি বেঁচে গেল, দেহটা কিছু ঘায়েল হল।

সেদিন বিকেল থেকেই মারামারি বাড়াবাড়িতে পরিণত হল। আক্রমণ, প্রতি আক্রমণ। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষই আদালতে উপস্থিত। তিন চারটে মামলার আমি আসামী। একটা মামলায় তো পুলিস আমার ও সত্যব্রত সেনের গ্রেপ্তারের জন্য ওয়ারেন্ট বের করেছিল। কারণ আঘাতপ্রাপ্ত ছাত্রটির নাকি মৃত্যুকালীন জবানবন্দী নিতে হয়েছিল। বেশ কিছুদিন চলেছিল সংঘর্ষ। স্কুল কলেজে পড়া বন্ধ। শিক্ষক অভিভাবক সকলেই উদ্বিগ্ন। প্রিন্সিপাল রাধাগোবিন্দ নাথ প্রোফেসার ও কয়েকজন উকিলকে নিয়ে এক কমিটি গঠন করলেন উভয় দলের বক্তব্য শুনে একটা মিটমাট করার জন্য। কমিটিতে তর্ক বিতর্ক, কথা কাটাকাটি চলতে লাগল। অবশেষে পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে একটা মীমাংসা হয়ে গেল। শহরে শান্তি ফিরে এল। সরকারী উকিল ভূধর দাশের চেষ্টায় মামলাগুলোও উঠিয়ে নেয়া হল। সরকারী উকিল হলেও ভূধর দাশ আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।

মারামারিতে অমর দাস, সুকুমার মুখার্জী ও ননী মজুমদারের মাথা ফেটেছিল। হাত পা জখম হয়েছিল অনেকেরই। আর লাভ হয়েছিল পুলিসের। মারামারিতে জড়িয়ে পড়ার ফলে দলের লোকদের পুলিস চিনতে পারল খুব সহজে। তারা বলত মারামারিতে হস্তক্ষেপ করবে না শুধু নাম টোকাই তাদের কাজ। আমরা বুঝতে পারতাম মারামারিতে উভয় দলই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবু দলাদলি, মারামারি হত। এখনও হয়, ভবিষ্যতেও হবে।

প্রতিপক্ষকে জব্দ করার আর একটি অহিংস অস্ত্র ছিল—বদনাম রটানো। "চরিত্র খারাপ"—এ বদনামটি প্রচার করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যায় খুব সহজে। আমার বিরুদ্ধে এ অস্ত্রটিও প্রয়োগ করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করতে ইচ্ছে করে দেশ নেত্রী লাবণ্যলতা চন্দের কথা।

১৯৩০ সালে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উপর পুলিসের নির্মম অত্যাচার

স্বচক্ষে দেখে তিনি মর্মাহত হন ও সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার পদত্যাগ করেন। পরে অভয় আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'কন্যা শিক্ষালয়' নামে কুমিল্লার একটি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। একদিন তিনি আমাকে খুব দুঃখের সঙ্গে বল্লেন যে, তাঁর চরিত্রের উপর কটাক্ষ করে একটি ছাপানো প্রচার পত্র বিলি করা হয়েছে শহরে। তাঁর এত বড় ত্যাগের কথা ভাবল না একবার প্রতিপক্ষ।

এই অস্ত্রটি আজ কালও ব্যবহৃত হয় দল থেকে অবাঞ্ছিত লোককে বহিষ্কার করার জন্য। এখন এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ। আমাদের সময়ে অর্থের প্রাচুর্য ছিল না। আত্মসাতের প্রশ্নও ছিল না। যাহোক, আমাদের ঘায়েল করার জন্য প্রতিপক্ষের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বিরোধীতার ফলে ক্রমে ক্রমে আমাদের সংগঠন প্রসারিত ও শক্তিশালী হয়ে উঠল।

॥ প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম ॥

আমাদের সংগঠন প্রসারিত হয়, প্রায় সব পাড়াতেই পার্টির শাখা স্থাপিত হয়েছে।

আমাদের দলের সদস্য কুমিল্লা জিলা স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সুধীর ব্রহ্ম একদিন আমাকে বল্ল, তাকে যে সব বই পড়তে দিতাম সে সব বই তার দিদি প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম পড়েছে এবং আমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে সবিশেষ জানার জন্য খুবই আগ্রহী। তাই সে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

গোপন রাজনৈতিক কর্মে মেয়েদের আমরা পরিহার করেই চলি, সুতরাং একটি মেয়ের সঙ্গে আলোচনা করতে আমার উৎসাহ ছিল না। কিন্তু কৌতূহল হল এই মেয়েটি দেশাত্মবোধক বই পড়ার জন্য এত উৎসাহী কেন, দেখা করার জন্য তাগিদ দিচ্ছে কেন?

সুধীর ব্রহ্মের পিতা রজনী ব্রহ্ম আইন ব্যবসায়ী। কংগ্রেসের আহ্বানে আদালত বর্জন করেছিলেন। কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন।

সুধীরকে খুঁজতে গিয়ে কয়েকবার তাঁর দেখা পেয়েছি এবং তা মোটেই প্রীতিদায়ক হয়নি। রাশভারি কড়া মেজাজের লোক, ছেলেমেয়ে তাকে বেশ ভয় করত। আমিও তাঁকে এড়িয়ে চলতাম। সুতরাং তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর মেয়ের সঙ্গে গোপনে কথা বলা তো রীতিমত দুঃসাহসিক কাজ। তাই ইতস্তত করছিলাম।

সুধীর তা বুঝতে পেরে বল্ল, 'ভাবনার কিছু নেই। দিদি অসুস্থ, স্কুলে যাচ্ছে না। দুপুরে বাবা বাড়ী থাকেন না। মাও ঘুমিয়ে থাকেন। সুতরাং সে সময়ে বাড়ী গেলে নির্ভয়ে আলোচনা করা যাবে।'

মনে হল পরিকল্পনাটা বেশ নিরাপদ তাই রাজী হলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সুধীরের বাড়ীতে গেলাম।

সুধীরের দিদি প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম স্থানীয় ফয়জন্নেসা স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। ছোটখাট, কাল, স্বাস্থ্যবতী মেয়েটি। চেহারায় এক তেজস্বী ভাব পরিস্ফুট।

সাক্ষাৎ করতে সে বল্ল, 'আপনার কথা অনেক শুনেছি। তাই খবর দিয়ে আনলাম আলোচনা করার জন্য।'

'বল কি তোমার বক্তব্য?'

'আচ্ছা, আপনাদের যে গোপন সংস্থা তাতে মেয়েরা স্থান পাবে না কেন?'

'গোপন সংস্থার সভ্যদের মাথার উপর ঝুলছে ফাঁসির দড়ি, নির্বাসন দণ্ড—এক কথায়, আগুন নিয়ে খেলা। মেয়েরা এসব সহ্য করতে পারবে না।'

'কেন পারবে না? স্বাধীনতার জন্য মেয়েরা কি লড়তে ও মরতে পারে না? ঝাঁসীর রাণী কি এ দেশের মেয়ে ছিল না?'

'তা ঠিক, তবে আমাদের বিপ্লবী দলে মেয়েদের নেবার কোন পরিকল্পনা নেই। তবে শুনেছি কোন কোন দল গোপনে অস্ত্রশস্ত্র রাখা ও তা বহন করার জন্য মেয়েদের সাহায্য নেয়। আমাদের এখনও তেমন প্রয়োজন দেখা দেয় নি। অস্ত্র এখনও পাই নি।"

'অস্ত্র রাখা ছাড়া আর কি কোন কাজ নেই আপনাদের দলের? আমি সুধীরের চেয়ে ভাল ভাবে কাজ করতে পারব। স্বাধীনতার জন্য আমি সব রকম বিপদ বরণ করতে পারব। আমাকে আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।'

'তোমার কথা শুনলাম, কিন্তু এক্ষুনি এবিষয় কিছু বলতে পারছি না। আমাদের দলের নেতার সঙ্গে কথা বলে পরে জানাব।'

তার সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম মেয়েটির দেশপ্রেম খুব গভীর, দেশের মুক্তির জন্য কাজ করবার প্রবল ইচ্ছা, দেহ ও মনে শক্তি আছে, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আছে। ক্ষুরধার বিপ্লবের পথে চলতে এ মেয়ের পদস্খলনের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীসঙ্ঘের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের কথা পূর্বেই বলেছি। সেই দলের লীলা নাগের কথা অনেক শুনেছি। ঢাকায় মেয়েদের এক বিরাট সংস্থা গড়ে তুলেছেন তিনি। শ্রীসঙ্ঘে অনেক বিপ্লবী মহিলা সদস্য আছে। আমি জানতাম ননীবালা দেবী ও দুকড়িবালা দেবী বিপ্লবীদের সাহায্য করেছিলেন ও নীরবে সহ্য করেছিলেন পুলিসের অমানুষিক অত্যাচার। তাঁরা দুজন হাসিমুখে সশ্রম কারাদণ্ডও ভোগ করেছেন। তবে এই সব মহিলারা ছিলেন বয়স্কা আর প্রফুল্লনলিনী নেহাৎ বালিকা—একেবারে নাবালিকা। গুপ্ত দলের কাজের দায়িত্ব এই মেয়ে নিতে পারবে কি না, তাকে দায়িত্ব দেয়া সঙ্গত হবে কি না এটাই বড় প্রশ্ন। তার কথায় মনে হল অপরিণত বয়স হলেও গূঢ়দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা তার আছে। তাই শেষপর্যন্ত একে কেন্দ্র করে দলের মহিলা শাখা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলাম, অবশ্য যদি দলের নেতার সম্মতি পাই।

দলনেতা ললিতমোহন বর্মণের সঙ্গে এ নিয়ে একদিন আলোচনা করলাম। আমার সকল বক্তব্য ও প্রফুল্ল ব্রহ্ম সম্পর্কে আমার মতামত শুনে তিনি সম্মতি দিলেন আমার প্রস্তাবে। অবশ্য এ প্রচেষ্টায় যে

নানা বাধা ও বিপদ আসতে পারে সে সব কথা বলে সতর্ক করে দিতে ভুললেন না।

॥ স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর স্থান ॥

দলনেতা আমাকে এই গুরু দায়িত্ব তো দিলেন। কিন্তু এ দায়িত্ব পালন সম্বন্ধে আমার মনে নানা ভাবনা চিন্তার ঝড় বইতে শুরু করল। কোমল স্বভাব, ভাবপ্রবণ মেয়েরা কি রক্তের পিচ্ছিল পথে দৃঢ়পদে অগ্রসর হতে পারবে? সংগ্রামের জন্য দৈহিক বল, মনোবল দুটিরই প্রয়োজন। ইচ্ছা থাকলেও মেয়েরা কি তা অর্জন করতে পারবে? প্রকৃতিগত বাধা, দৈহিক বাধা কি তারা জয় করে পুরুষ সহ-যোদ্ধাদের মতো সংগ্রামে এগিয়ে যেতে পারবে?

নেতিমূলক ভাবনার সাথে সাথে ইতিমূলক ভাবনাও মনে জাগে। ঝাঁসীর রাণীর কথা। দৃঢ় হস্তে তরবারি ধারণ করে রণাঙ্গণে তিনি সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন। ভারতের 'প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে' মহিলা হলেও তাঁর কৃতিত্ব তো নানা সাহেব তাঁতিয়া টোপির চেয়ে কিছু কম ছিল না। মনে জাগে আনন্দমঠের শান্তি, পথের দাবীর সুমিত্রার কথা। মনে পড়ে 'না জাগিলে সব ভারত ললনা এ ভারত আর কভু জাগিবে না।' এসব কি শুধু কল্পনাতে সাহিত্যের খোরাক হয়েই থাকবে? বাস্তবে কি কখনও রূপ নেবে না? চলার-পথের 'রেখা' বা 'নীলা' কি শুধু কবির কল্পনা মাত্র?

মনে পড়ে পথের দাবীর সুমিত্রা অপূর্বকে বলছে, 'আপনি নিজে যখন কাজে লাগবেন, তখনই এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করবেন যে, যাকে আপনি নারীর বাইরে এসে ভিড় করা বলছেন, সে যদি কখনও ঘটে, তখনই দেশের কাজ হবে। নইলে কেবল মাত্র পুরুষের ভিড়ে শুকনো বালির মতো সমস্ত ঝরে পড়বে, কোনদিন জমাট বাঁধবে না।'

আরও মনে পড়ে সব্যসাচী ভারতীকে বলছেন, 'আগুন যদি কখনও জ্বলছে, এদেশে দেখতে পাও যেখানেই থাকো ভারতী,

এই কথাটা আমার তখন স্মরণ করো এ আগুন মেয়েরাই জ্বেলেছে। ……মেয়েদের পরে আমার যে কত লোভ, কত ভরসা, সে কথা নিজে তোমাদের জানাবার সুযোগ হলো না, কিন্তু পার যদি দাদার হয়ে এ কথাটি তাদের জানিয়ে দিও বোন।'

ভারতী বলেছিল, 'জানাব এই যে আমাদের শুধু তুমি বলি দিতে চাও।'

সব্যসাচী জবাব দিলেন, 'বেশ তাই বলো বাংলাদেশের একটি মেয়েও যদি তার অর্থ বোঝে, আমি তাতেই ধন্য হবো।'

মনে পড়ল বীরনারী সরলা দেবী চৌধুরাণীর আমাকে একান্তে বলা কিছু কথা। কিছুকাল আগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। তাঁকে ট্রেনে তুলে দিতে স্টেশনে গিয়ে শুনলাম ট্রেন যথাসময়ে আসছে না। তাঁর সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে গেলাম, অনেক কথা শুনলাম। তাঁর প্রবর্তিত 'বীরাষ্টমী ব্রত' বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল আমাকে। তাঁর লেখা 'বিলিতী ঘুষি বনাম দেশী কিল' সে যুগে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।

এইসব কথা ভেবে মেয়েদের জন্য একটি শাখা স্থাপন করতে উৎসাহ বোধ করলাম।

॥ বৈপ্লবিক কর্মে প্রফুল্লর আগ্রহ ॥

অন্যান্য বিপ্লবীদলে নারী সদস্য আছে কিনা এবং তাদের সাহায্য কি ভাবে নেওয়া হয়ে থাকে এসব কিছুই আমার জানা ছিল না। তবুও একাজে এগিয়ে যাওয়া ঠিক করলাম।

সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান সমস্যা হল মেয়েদের সঙ্গে অবাধে সাক্ষাতের। ঐ রকম গোপন সাক্ষাতে কাজ হবে না। ভয়ে ভয়ে সুস্থ আলোচনা চলে না। তাই আমার প্রথম কাজ হল এক নির্ভরযোগ্য সাক্ষাতের স্থান বার করা যেখানে মেয়েদের সঙ্গে সহজে ও নির্ভয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

আমার এক দিদি আমাদের প্রতি খুব সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর নাম সুহাসিনী পাল। তাঁরই দেওর ছিলেন দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় ৭ বছরের দণ্ডপ্রাপ্ত বিপ্লবী যশোদা পাল। টি. বি. রোগে আক্রান্ত এবং প্রচুর রক্তবমনের ফলে যখন বাঁচবার আর আশা নেই তখন তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিয়েছিল সরকার মুক্তিব পর কুমিল্লায় পৌঁছবার কিছুকাল পরেই তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর শেষ কটা দিনে তাঁকে দেখার ও তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছিলাম আমি।

এই দিদি ছিলেন নানুয়ার দীঘির পাড়ে এক প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকা। দোতলা বাড়ীর নীচে স্কুল বসত আর উপর তলায় থাকতেন শিক্ষিকারা। তাঁর কোয়ার্টারে আমার অবাধ গতি ছিল। তাঁর ওখানেই একদিন দুপুরে স্কুল পালিয়ে চলে আসার জন্য প্রফুল্লকে খবর দিলাম। সুধীর তাকে পৌঁছে দিয়ে গেল। সেদিন দীর্ঘ সময় আলোচনার সুযোগ পেলাম।

প্রফুল্লনলিনী সেদিন আমাকে জানাল, তার খুব ভাল লেগেছে 'আনন্দ মঠের' শান্তিব গানটি।

'দরবড়ি ঘোড়াচড়ি কোথা তুমি যাও রে ?
সমরে চলিমু আমি হামে না ফিরাও রে।

* * * *

রমনীতে নাহি সাধ রণজয় গাও রে।'

সে আরও জানাল 'পথের দাবী'র সুমিত্রা চরিত্রটিও তার ভাল লেগেছে। সুমিত্রাই তার আদর্শ। সুমিত্রা বা ভারতীর মত, 'চলার পথের' রেখা বা নীলার মত সেও যদি কোন দিন রিভলভার নিয়ে চলাফেরা করার সুযোগ পায় তাহলে জীবন সার্থক মনে করবে।

আমি বল্লাম, 'এটা ও পড়েছো ত সব্যসাচী ভারতীকে বলছে—"'আমি বিপ্লবী, আমার মায়া নেই, দয়া নেই, স্নেহ নেই। পাপ-পূণ্য

আমার কাছে মিথ্যা পরিহাস। ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, আমার একটি মাত্র সাধনা।”

আরও বল্লাম, ‘বিপ্লবীর পথ যে কত কণ্টকাকীর্ণ, কত বিপজ্জনক তা বুঝতে পার? এর জন্য শুধু ত্যাগ নয়, অত্যাচারও সইতে হবে অনেক। মেয়েরা তা সইতে পারবে কি না সেটাই হচ্ছে বড় প্রশ্ন।’

তার জবাবে সে বল্ল, ‘আমাকে কিছু কাজ দিয়েই দেখুন না; কতটা সামর্থ আমার আছে তা কাজেই প্রমাণ করব। ননীবালা দেবী ও দুকড়িবালা দেবীর কাহিনী আমিও জানি।’

আমি যত ভয় ভাবনার কথাই বলি না কেন, সে নির্বিকার—দৃঢ়-সংকল্প।

ঐদিন আলোচনা করে আশ্বস্ত হলাম যে তাকে কেন্দ্র করে মেয়েদের সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব। তাকে তখন আমাদের নেতার সম্মতির কথাও জানিয়ে দিলাম এবং বুঝিয়ে দিলাম প্রাথমিক কাজের ধারা। প্রফুল্ল খুবই খুশি হল, উৎসাহিত হল। যথাসময়ে সুধীর এল তাকে নিয়ে যেতে। স্কুল ছুটির সময় অনুযায়ী বাড়ী পৌঁছতেই হবে।

শুরু হল আমার আর এক অভিনব অধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্মের সাংকেতিক নাম রেখেছিলাম ‘সুমিত্রা’ আর শান্তি ঘোষের নাম ‘মিনতি’। ওরা যখন জেলে ছিল তখন এই সাংকেতিক নামেই জেলখানা থেকে (অবশ্যই গোপন পথে) আমাকে চিঠি লিখত। আর সুদূর দেউলী বন্দী শিবিরে কর্তৃপক্ষ বিনা সন্দেহেই আমার কাছে তা পৌঁছে দিত। অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রফুল্ল যে চিঠি লিখেছিল তা আমার বন্ধুদের বিশেষতঃ রেবতী বর্মণের খুব প্রশংসা লাভ করেছিল।

প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম কাজ শুরু করল তার সহপাঠীদের মধ্যে। যথারীতি প্রথমে দেশাত্মবোধক বই এবং

পরে সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ বই তাদের দিত পড়বার জন্য। সে সব বই পড়ার পরে আলোচনা করে যাদের উৎসাহী মনে হত তাদের সঙ্গে আমার কথা বলার ব্যবস্থা করা হত।

॥ শান্তি ঘোষ ॥

প্রফুল্ল একদিন খবর পাঠাল এক নির্দিষ্ট স্থানে এক শনিবার বিকেলে অপেক্ষা করার জন্য। স্কুল ছুটির পর সে আমাকে নিয়ে যাবে তার এক সহপাঠীর বাড়ী। যথাসময়ে আমরা সেখানে গেলাম। কিন্তু তার সহপাঠীর মা তখন বাড়ী ছিলেন না। মার অনুপস্থিতিতে সে আমার সঙ্গে কথা বলতে রাজী হল না, সাহস পেল না। সহপাঠী পরবর্তী কালের বিখ্যাত শান্তি ঘোষ। তাকে দূর থেকে দেখলাম, আকৃতি প্রফুল্লের ঠিক বিপরীত, গৌরবর্ণা, দীর্ঘাঙ্গী ও স্বাস্থ্যবতী।

'রিক্রুটিং' কাজে প্রথম প্রচেষ্টা এভাবে ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় প্রফুল্ল খুবই দুঃখিত ও নিরাশ হল। কিন্তু আমি তাকে উৎসাহ দিলাম এবং পরবর্তী প্ল্যান বুঝিয়ে দিলাম।

শান্তি ঘোষের বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক। সততা, অমায়িক ব্যবহার ও পাণ্ডিত্যের জন্য শহরে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। সুশ্রী ও সৌম্য চেহারা ছিল তাঁর। কলেজের ছাত্ররা তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করত। ১৯২৬ সালে যখন তিনি পরলোক গমন করেন আমরা ছাত্ররা তাঁর ধর্মসাগর পশ্চিম পাড়ের বাড়ীতে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্য গিয়েছিলাম। তখন শান্তি ছিল খুবই ছোট।

শান্তি ঘোষের মা সলিলবালা ঘোষকেও আমি চিনতাম। তিনি নিয়মিত খদ্দর পরতেন, কংগ্রেসের সভাসমিতি আন্দোলনে যোগ দিতেন। পরিস্থিতি বিবেচনা করে শান্তির মার সঙ্গেই আগে পরিচিত হওয়া সঙ্গত মনে করলাম।

কুমিল্লা কংগ্রেসেরও সদস্য ছিলাম আমরা। আমাদের বন্ধু ভুবনবিহারী বর্দ্ধণ ছিলেন জেলা কংগ্রেস কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক। কংগ্রেসের কাজের সঙ্গে আমরা সংশ্লিষ্ট ছিলাম গুপ্ত দল গঠনের প্রয়োজনেই।

কংগ্রেসের কাজ নিয়ে কয়েকদিন গেলাম সলিলবালা ঘোষের কাছে। পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হতে বেশী দিন লাগল না। শান্তির সঙ্গে কথা বলারও সুযোগ হয়ে গেল। পরে প্রফুল্লনলিনীকে একদিন নিয়ে এলাম শান্তিদের বাড়ীতে আমার বোন পরিচয় দিয়ে। আমার ও প্রফুল্লের যাতায়াত এবং শান্তির সঙ্গে আলাপ আলোচনার পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। অচিরেই শান্তি দলভুক্ত হয়ে গেল, প্রফুল্লের সঙ্গে পরামর্শ করে সংগঠনের কাজ আরম্ভ করে দিল। একই স্কুলে একই ক্লাশের ছাত্রী এবং দুজনের বাড়ীও ছিল কাছাকাছি। ফলে খুবই সুবিধে হয়ে গেল আমাদের কাজের।

মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা মনে পড়ছে। স্বচ্ছল ভদ্র পরিবারের মেয়ে, বাবা তার সরকারী বড় কর্মচারী, পড়ে সরকারী স্কুলে। প্রফুল্লনলিনীর সাথে কথাবার্তার পর তার খুব আগ্রহ হয় আমার সঙ্গে কথা বলার। স্কুলে যাতায়াত করে স্কুলের গাড়ীতে। তার একা কোথাও যাবার জো নেই। সাক্ষাতের সমস্যা খুবই কঠিন, আগ্রহও উভয় পক্ষেরই বেশী। একটা পথ শেষ পর্যন্ত বের হয়ে গেল। তার বড় বোনের বিয়ের দিনে গোপনে যেতে হল আমাকে তার বাড়ীতে এবং অন্ধকারে তাদের দালানের চিলেকোঠায় সাক্ষাত হল, কথা হল তার সঙ্গে। তখন কেউ সেখানে আমাকে দেখে ফেল্লে পরিণতি কি হতে পারত সেটা ভাবতে এখনও রোমাঞ্চিত হই। মেয়েটির নাম মাধুরী দত্ত।

আর একটি ঘটনা। প্রফুল্লের সহপাঠী জাহানারা মুসলমান মেয়ে, গোঁড়া মুসলমান পরিবার। সেও দলভুক্ত, অর্থ দিয়ে সাহায্য করছে, একবারটি কথা বলতে চায় আমার সঙ্গে। চিটি লিখে তার প্রশ্নের

জবাব দিই, তাতে সে সন্তুষ্ট নয়। একদিন আমার ভাইঝি মণিকা নন্দীর খোঁজ নেবার ছল করে গেলাম স্কুলের গেটে। জাহানারাকে নিয়ে এল প্রফুল্ল, দেখা হল, কথাও হল সামান্য।

এমনি ধারা নানা ছল-চাতুরি ও দুঃসাহস করে মিশতে হত মেয়েদের সঙ্গে, কাজ করতে হত তাদের নিয়ে।

শান্তি সেনের মার কাছে আমি ছিলাম প্রফুল্ল ব্রহ্মের বড় ভাই। মেয়েব সহপাঠীর ভাই, তাই আপ্যায়ণের অভাব হত না কখনও। কোটবাড়ীর নিকটে বাড়ী ছিল তাদের। কোটবাড়ীতে যেতে বা আসতে আশ্রয় নেওয়া যেত সেখানে, ব্যবহার করা যেত বাড়ীটিকে আমাদের কাজে। অবশ্যই বাড়ীর মালিকের অজ্ঞাতে।

॥ সুনীতি চৌধুরী ॥

ক্রমশঃ ফয়জেন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি মেয়ে আমাদের পার্টিতে যোগ দিল। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সুনীতি চৌধুরী। প্রফুল্ল ও শান্তির চেয়ে সুনীতি বয়সে ছোট ছিল। কিন্তু তার সাহস ও দৃঢ় সংকল্প দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ঐটুকু মেয়ে কথাবার্তায় চালচলনে প্রথম সাক্ষাতেই মনে এক ছাপ রেখে দিয়েছিল। আর একটা বিষয় প্রথমেই লক্ষ্য করেছিলাম, সে খুব সহজ ভাবে মেলামেশা করতে পারে, অসঙ্কোচে তার বক্তব্য রাখতে পারে। শান্তি আর প্রফুল্ল একটু গম্ভীর প্রকৃতির ছিল। কিন্তু সুনীতি খুব হৈ চৈ করতে ভালবাসত।

সুনীতির সঙ্গে প্রথম আলাপ আলোচনা করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল আমার দিদির সেই স্কুল বাড়াতে, সেটা ছিল সুনীতির বাড়ীর নিকটে। সুনীতির সঙ্গে এল উর্মিলা গুহ, একই পাড়ায় থাকত, একই স্কুলে পড়ত, একই জায়গায় প্যারেড, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা শিখত তারা। উর্মিলাও পার্টিতে যোগ দিল। এভাবে কিছুকালের মধ্যে যে মেয়েরা দলে এল তাদের মধ্যে ছিল নীলিমা নন্দী,

বনলতা সরকার, শান্তি সেন, ঊষা চক্রবর্ত্তী, জাহানারা চৌধুরী, মনোরমা সেন প্রভৃতি।

॥ ছাত্রী সঙ্ঘ ॥

মেয়েদের তথা ছাত্রীদের মধ্যে কিছু পার্টি সদস্য ও সমর্থক পাবার পর সংগঠনকে প্রসারিত করার জন্য ত্রিপুরা জেলা ছাত্রী সঙ্ঘ গঠন করা হল। প্রেসিডেণ্ট প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম, সেক্রেটারী শান্তি ঘোষ। এই সমিতি গঠন করায় প্রকাশ্য আন্দোলনের পেছনে বিপ্লবী সংগঠনের কাজকে গোপন রাখা সম্ভব হল।

ছাত্রী সঙ্ঘের প্রথম কাজ হল পাড়ায় পাড়ায় মেয়েদের ক্লাব করে লাঠিখেলা ও ছোরাখেলা শেখাবার ব্যবস্থা করা। প্রফুল্ল ও শান্তির বাড়ীর নিকটে বাগিচাগাঁয়ে একটি ক্লাব করা হল ডাঃ মনোরঞ্জন দাসের বাড়ীতে। আর একটি ক্লাব হল সুনীতি চৌধুরীর বাড়ীর কাছে দিগম্বরীতলায় ডাঃ উমা মজুমদারের বাড়ীতে। নাম জ্ঞান বিকাশিনী সমিতি। এই দুটি ক্লাবেই বেশী সংখ্যায় মেয়েরা জড় হত। বঙ্কিম চক্রবর্তী ও নৃপেন সেন শেখাত লাঠি ও ছোরা খেলা। কিছুদিন পর প্রফুল্ল, শান্তি ও সুনীতি নিজেরাই অন্য মেয়েদের ছোরাখেলা শেখাতে আরম্ভ করল। বসন্ত মজুমদারের বাড়ীতেও মেয়েদের লাঠি ও ছোরা খেলা শেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অরুণা মজুমদার খুব উৎসাহী কর্মী ছিল। মেয়েদের সব কটা ক্লাবেই প্যারেড শেখাত নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য ও বঙ্কিম চক্রবর্তী। প্যারেডে দক্ষতা স্বল্প সময়ে আয়ত্ত করায় সুনীতিকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মেজর করা হয়েছিল।

—চার—

॥ কুমিল্লায় আইন অমান্য আন্দোলন ॥

১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ মহাত্মা গান্ধী লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য ডাণ্ডী অভিমুখে যাত্রা করলেন। সারা ভারত জুড়ে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। কুমিল্লাতেও এই আইন অমান্য আন্দোলন করার জন্য ত্রিপুরা জেলা কংগ্রেস কমিটিকে নতুন করে সংগঠিত করা হয়। আন্দোলন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কয়েকটি কমিটি গঠিত হয়। মণীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী হলেন সম্পাদক. সংগঠন কমিটির দায়িত্ব দেওয়া হল ব্রজেন্দ্র বিজয় রায়কে। ইস্তাহার প্রকাশ ও প্রচারের দায়িত্ব রইল পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপর. স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী রইল যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তীর হাতে, বিলাতী-দ্রব্য বর্জন আন্দোলনের ভার নিলেন রাইমোহন পাল। অন্যান্য যারা কমিটিতে ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কামিনী কুমার দত্ত, ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণান ভৌমিক, ফনী নাগ, নিবারণ ঘোষ, স্বর্ণকমল রায়, অন্নদা চৌধুরী, মিহির চ্যাটার্জী, ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী, পুলিন গুপ্ত, হবিবর রহমান, মালেক মিঞা, তারু মিঞা, আসরফউদ্দিন আমেদ চৌধুরী।

স্থির হল যে, আইন অমান্য করার জন্য প্রথম দলের নেতা হবেন আসরফউদ্দিন আমেদ চৌধুরী, দ্বিতীয় দলের নেতা স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, তারপর নেতৃত্ব নেবেন পুলিন গুপ্ত, অবনী দাস প্রভৃতি।

কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে আসরফউদ্দিন আমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর শোভাযাত্রা অগ্রসর হল কোর্টের অভিমুখে।

কিছুটা অগ্রসর হবার পর রাজবাড়ীর পাশে মিছিলের গতি রোধ করল পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ মারের নেতৃত্বে এক বিরাট পুলিস

বাহিনী। পুলিসের নিষেধ অমান্য করার চেষ্টা করা মাত্রই মিঃ মারে সাহেব স্বয়ং পুলিস সহ সত্যাগ্রহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, বেদম লাঠিপেটা শুরু করল। নির্দয় ভাবে প্রহৃত হলেন কুমিল্লা বার এসোসিয়েশনের জনপ্রিয় সেক্রেটারী ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এবং আরও অনেক সত্যাগ্রহী।

শাসকদের পক্ষ থেকে এরকম একটা প্রচণ্ড আঘাত আসবে এটা কংগ্রেসের নেতারা অনুমান করতে পারেননি। তাই আহতদের সেবা শুশ্রূষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু অবস্থা দেখে সেদিনই সন্ধ্যার মধ্যে একটা রীতিমত হাসপাতাল তৈরী করা হল চৌমুনিতে। আহতদের চিকিৎসার ভার নিলেন ডাঃ নৃপেন বসু, ডাঃ শশধর দাশগুপ্ত, ডাঃ বিপিন পাল, ডাঃ কামিনী বর্ধণ, ডাঃ উষারঞ্জন মজুমদার প্রভৃতি।

পুলিসের এই আকস্মিক ও অমানুষিক অত্যাচারের ফলে জনগণের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। দলে দলে লোক এসে সত্যাগ্রহীর তালিকায় নাম লেখাতে লাগল। পরদিন আইন অমান্য করতে যাবার জন্য সত্যাগ্রহীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল—'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি কাড়াকাড়ি।'

পরদিন আর একদল সত্যাগ্রহীকে মিঃ মারের নেতৃত্বে পুলিস আবার নির্মম লাঠিপেটা করল। এই ভাবে পর্যায়ক্রমে চলতে লাগল সত্যাগ্রহ ও পুলিসের প্রহার আর রোজ হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বাড়তে লাগল। এই অত্যাচারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর সুদূর গ্রাম থেকেও লোক আসতে লাগল কুমিল্লায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিয়ে আইন অমান্য করার জন্য। সারা জেলায় এক অভূতপূর্ব আলোড়ন দেখা দিল। প্রতিদিন বিকালে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মিছিল বের হতে লাগল। আর রোজ ভোরে হত মেয়েদের প্রভাতফেরী। এই প্রভাতফেরীর নেতৃত্ব করতেন হেমপ্রভা মজুমদার, নবনীত কোমলা সিংহ, প্রফুল্লময়ী বসু প্রভৃতি। অজয় ভট্টাচার্য, সঞ্জয় ভট্টাচার্য,

সুবোধ পুরকায়স্থ রচিত দেশাত্মবোধক গান গাওয়া হত প্রভাতফেরীতে। বহু ছেলেমেয়ে যোগ দিত প্রতিদিন।

অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিসের নৃশংস অত্যাচার দেখে ফয়জন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের (সরকারী) প্রধান শিক্ষিকা লাবণ্যলতা চন্দ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগ পত্র পেশ করলেন। পরে তিনি অভয় আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আজীবন দেশের কাজ করে গেছেন।

পুলিসের অত্যাচারের ফলে আন্দোলন আরও প্রবল ও প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে দেখে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্টিভেন্স দমন নীতির নূতন কৌশল অবলম্বন করল। ১৪৪ ধারা তুলে দিয়ে নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার করতে শুরু করল। কারাদণ্ড দিয়ে তাঁদের জেলে বন্দী করে রাখাটাই নিরাপদ মনে করল। সুতরাং গ্রেপ্তার হয়ে দণ্ডিত হলেন, জেলে গেলেন, আসরফউদ্দিন আমেদ চৌধুরী, পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র চক্রবর্তী, শ্যামাকমল ভট্টাচার্য, অবনী দাস, হেমপ্রভা মজুমদার, নবনীত কোমলা সিংহ, প্রফুল্লময়ী বসু প্রভৃতি। মণীন্দ্র চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করার পর কংগ্রেসের সেক্রেটারী হলেন হবিবর রহমান ও ভুবন বিহারী বর্ধণ। তাঁদের নেতৃত্বে আন্দোলন অব্যাহত ভাবে চলতে লাগল।

॥ লবণ-আইন ভঙ্গ ॥

৬ই এপ্রিল মহাত্মা গান্ধী লবণ আইন অমান্য করলেন। অভয় অশ্রমের পরিচালনায় কুমিল্লার স্বেচ্ছাসেবক দল মেদিনীপুরে কাঁথির সমুদ্র উপকূলে লবণ প্রস্তুত করে আইন অমান্য করতে লাগল।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ললিতমোহন বর্মণ ১৪ই এপ্রিল পদব্রজে ১২৫ মাইল দূরবর্তী নোয়াখালী সমুদ্রতীরে লবণ প্রস্তুত করার জন্য যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল ত্রিশজন স্বেচ্ছাসেবক। তাদের মধ্যে ছিলেন শৈলেশ চাটার্জী, ফণী গুহ, চিত্ত দত্ত, মোহিনী ব্যানার্জী, বীরেন্দ্র চন্দ্র দত্তগুপ্ত, মণীন্দ্র পাল, হীরালাল দেব, ব্রজেশ চক্রবর্তী

প্রভৃতি। ললিত বাবুর পদযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল এই উপলক্ষ্যে গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিয়ে বিপ্লবী সংগঠনের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

নোয়াখালীতে সমুদ্র জল হতে লবণ তৈরী করে আইন ভঙ্গ করার জন্য কুমিল্লায় বিভিন্ন স্থান থেকে সত্যাগ্রহীরা সমবেত হয়েছিল। সেখানেও পুলিস অমানুষিক অত্যাচার করে সত্যাগ্রহীদের নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য আমি ও অমূল্য কাঞ্চন দত্ত রায় একসঙ্গে নোয়াখালি গিয়েছিলাম।

আমরা নোয়াখালি পৌঁছে সেখানকার বিশিষ্ট নেতা ক্ষিতীশ রায়চৌধুরীর আতিথ্য গ্রহণ করি। পরদিন বিকেলে নির্দিষ্ট সময়ে সমুদ্র থেকে জল তুলে এনে টাউন হলের প্রাঙ্গণে লবণ তৈরী করলাম। সেদিন আমাদের বাধা দেবার জন্য পুলিস ছিল না। নোয়াখালিতে আইন অমান্য করে এক হাঁড়ি সমুদ্রের জল নিয়ে ফিরে এলাম স্বগ্রাম কালীকচ্ছে।

পরদিন ডাঃ মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বাড়ীর মাঠে এক সভা হল। সেই সভায় আমি বক্তৃতা দিলাম এবং সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়ে লবণ প্রস্তুত করলাম। তারপর সেই বে-আইনী লবণ বিক্রি করে কংগ্রেসের কাজের জন্য টাকা তুলেছিলাম। সেই সভায় লবণ তৈরীর প্রণালী দেখার জন্য বেশ জনসমাগম হয়েছিল। চোখের সামনে এই ভাবে লবণ প্রস্তুত হতে দেখে লোকের মনে খুব উৎসাহ জাগল। অনেকেই সেই সভার মধ্যেই টাকা পয়সা দিয়ে বে-আইনী লবণ কিনে আইন ভঙ্গের উত্তেজনা অনুভব করেছিল। মণিকা নন্দীর পয়সা ছিল না সাথে, তাই কান থেকে সোনার দুল খুলে দিয়েই খানিকটা লবণ কিনে নিল, আইন অমান্যের রোমাঞ্চ অনুভব করল।

॥ পিকেটিং ॥

গ্রামের মানুষের এই উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে সরাইলের আফিং গাঁজার দোকানে পিকেটিং করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা হল।

পিকেটিং করার জন্য কালীকচ্ছও সরাইলের যুবকরা খুব উৎসাহে যোগ দিল। এই উপলক্ষে ইস্তাহার বার করার দায়িত্ব ছিল আমার উপর। ইস্তাহারের মারফতে কংগ্রেস আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন ও চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সংবাদ প্রচার করা হত। পিকেটিং এর কাজে যারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য দেওয়ান উবেদুল্লা, শৈলেন ভট্টাচার্য, চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, অমিয় ভট্টাচার্য, অমৃত বর্ধণ, লাল মোহন বর্ধণ, শৈলেশ চ্যাটার্জী, নরেশ চক্রবর্তী, হেমেন্দ্র রায় প্রভৃতি।

* * * *

ললিতমোহন বর্মণ নোয়াখালি থেকে ফিরে এসে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় লোকনাথ ট্যাঙ্কের পাড়ে এক সভা আহ্বান করলেন। সভায় প্রচুর লোক সমবেত হয়েছিল। সেই সভায় তিনি নোয়াখালি হতে নিয়ে আসা সমুদ্রের জলে লবণ তৈরী করেন ও তা বিক্রি করে অনেক টাকা সংগ্রহ করেন।

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের মত আইন অমান্য আন্দোলনেও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

মহাত্মাজীর পরবর্তী ডিক্টেটার আব্বাস তায়েবজার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সর্বাত্মক হরতাল প্রতিপালিত হয়। হাজার হাজার লোক পিকেটিং করে সমস্ত সরকারী কাজ কর্ম বন্ধ করে দেয়। এস, ডি, ও, এবং সেকেণ্ড অফিসার কাহারও পক্ষে কোর্টে যাওয়া সেদিন সম্ভব হয় নি।

পরদিন ললিতমোহন বর্মণ, দেবেন্দ্র তলাপাত্র, বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, অমূল্য কাঞ্চন দত্ত রায়, মণীন্দ্র পাল, ভুবনবিহারী বর্ধণ প্রভৃতি প্রায় উনিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং জেলের মধ্যেই বিচারের প্রহসন করে প্রত্যেককে দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের ফলে কুমিল্লায় আইন অমান্য আন্দোলন

কিছুটা স্তিমিত হয়ে যায়। কিন্তু পিকেটিং, মিছিল, প্রভাতফেরী ও সভাসমিতি যথারীতি চলতে থাকে। বিপ্লবী দলভুক্ত আমরা যদিও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, তবু গ্রেপ্তার এড়াতে সচেষ্ট ছিলাম। জেলে বন্দী হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া আমদের কাম্য ছিল না। বিশেষ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমাদের নেতাদের গ্রেপ্তারের পর কুমিল্লায় আমরা একটু গা ঢাকা দিয়ে থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করলাম। অবশ্য এই আইন অমান্য আন্দোলন আমাদের গুপ্ত সংগঠনকে প্রসারিত করতে অনেক সাহায্য করেছিল। ইংরেজ বিরোধী মনোভাব বেড়ে যাওয়ায় আমাদের কাজের সুবিধা হয়ে গিয়েছিল।

॥ গুপ্তচর বধ ॥

ইংরেজ রাজত্বের সাহায্যকারী সব কিছুর উপরই আমাদের অপরিসীম ঘৃণা ছিল। তাদের রাজত্ব কায়েম রাখার সংস্থাগুলিকেও স্বাভাবিক কারণেই ঘৃণা করতাম। বিদেশী শাসকদের সাহায্যের একটি স্তম্ভ ছিল কুমিল্লা জিলা স্কুল। এটি ছিল খাস সরকারী স্কুল। সরকারের কৃপালাভের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম পর্বে এই স্কুলের হেডমাস্টার ও রাজভক্ত শরৎ কুমার বসু জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রিপোর্ট করত ও বিপ্লবীদলের ছাত্রদের ধরিয়ে দিত। তার এই গুপ্তচর বৃত্তি ও দেশদ্রোহিতার শাস্তি একদিন বিপ্লবীরা দিল। ১৯১৫ সালের ৩রা মার্চ বিপ্লবীদের গুলিতে তাকে ধরাধাম ছেড়ে যেতে হল।

এই জিলাস্কুলটি পুড়িয়ে দিবার এক পরিকল্পনা করেছিলাম। এক সন্ধ্যায় আমি ও সুশীল ভট্টাচার্য (বর্তমানে 'দি মেলোডি' প্রতিষ্ঠানের মালিক) এক টিন পেট্রোল নিয়ে স্কুলের রেকর্ডরুমে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে এলাম। আগুন আমাদের আশানুরূপ ক্ষতি করতে পারে নি। শীঘ্রই লোকজন জড়

হয়ে আগুন নিভিয়ে দিয়েছিল। পুলিসও অনতিবিলম্বে এসে হাজির হয়েছিল। দারোয়ান বিবৃতি দিল চার পাঁচজন লোক তাকে ঘরে বেঁধে রেখে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। যদিও আমরা দারোয়ানের কাছেই যাই নি।

ছ-মাস পরেই ললিতমোহন বর্মণ, বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, অমূল্যকাঞ্চন দত্ত রায় ও অন্যান্য কর্মীরা মুক্তি পেলেন। তাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফিরে আসার পর ১৯৩১ সালে এক ছাত্র সম্মেলন আহ্বান করা হয়। সভাপতি হয়ে এলেন গিরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পতাকা উত্তোলন করলেন উল্লাসকর দত্ত, আর প্রধান অতিথি হয়েছিলেন জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী। খুব সাফল্যের সহিত সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

॥ বৈপ্লবিক কর্মে অর্থ সংগ্রহ ॥

১৯৩০ সালের আইন-অমান্য আন্দোলন সারা ভারতে গণজাগরণ এনে দিয়েছিল। তারই পাশাপাশি বিভিন্ন বৈপ্লবিক এ্যাকশন তরুণদের মনে এক নূতন আশার সঞ্চার করে নূতন পথের সন্ধান দিয়েছিল।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অধিকার, জালালাবাদের লড়াই, মেছুয়াবাজারের বোমার মামলা, লোম্যান, সিম্পসন হত্যা, রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ প্রভৃতি বহু দুঃসাহসিক বৈপ্লবিক কাজ ঐ বৎসর অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিপ্লবীদল নূতন উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে এই ধরণের এ্যাকশন করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠল। আমাদের সহযোগী বি, ভি, দলের সফল এ্যাকশন আমাদিগকে খুব উৎসাহিত করেছিল।

আমাদের দলের মধ্যেও একটা কিছু করার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। এই আকাঙ্ক্ষা বিশেষ ভাবে চঞ্চল করে তুলল বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যকে।

কিন্তু কোন বৈপ্লবিক কাজ করার জন্য যে অর্থের ও অস্ত্রের প্রয়োজন তার অভাব ছিল আমাদের। বিপ্লবীদলকে গড়ে তোলার

জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ ললিতমোহন বর্মণ সংগ্রহ করতেন দলের সভ্যদের ও সমর্থকদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে। কুমিল্লায় আমরাও প্রথম দিকে চাঁদার উপরই নির্ভর করতাম। আমাদের সাহায্যকারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কামিনীকুমার দত্ত, তিনি অর্থ দিয়ে আশ্রয় দিয়ে সবসময় সাহায্য করতেন। এই সাহায্যকারীদের মধ্যে আর যাঁদের নাম করা যায় তাঁরা হচ্ছেন অধ্যাপক জ্যোৎস্নাময় বসু, অধ্যাপক দিগিন দত্ত, অধ্যাপক পরেশ চৌধুরী, অধ্যাপক অজিত নন্দী, পরেশ চট্টোপাধ্যায়, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা ইন্দু দত্ত প্রভৃতি।

আমাদের মেয়েদের সংগঠন গড়ে উঠার পর দলের সভ্য এবং সমর্থক মেয়েরা যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করেছে। তাদের প্রায় সকলেরই কানের দুল, আংটি বা হার হারিয়ে গিয়েছিল। স্নানের সময় পুকুরে পড়ে গেছে এটাই ছিল মোক্ষম কৈফিয়ৎ। দামী হার পুকুরে পড়ে গেছে অথচ শান্তি নির্বিকার, তাই কৈফিয়ৎটা বিশ্বাস করেননি শান্তির মা। এইসব সোনার গয়না ক্ষেত্রীর দোকানে বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করতাম। মেয়েরা শুধু নয় ছেলেদের মধ্যেও কেউ কেউ সোনার জিনিষ এনে দিয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য লোকেন্দ্র সেনের নাম। লোকেন্দ্র সেন তার মার একটি মূল্যবান হার এনে দিয়েছিল। আমার মা তাঁর একটি হার যত্ন করে রেখেছিলেন বিয়ের পর আমার স্ত্রীকে দেবার জন্য। এটা নাকি পারিবারিক প্রথা। সে হারটিও আমি সংগোপনে সরাতে ও বিক্রি করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলাম।

॥ ডাকলুঠ ॥

দলের দৈনন্দিন কাজকর্ম এভাবে অর্থ সংগ্রহ করে চলে যায়। কিন্তু এদ্বারা বৈপ্লবিক কাজের প্রস্তুতি চলে না। তাই এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিলেন দলের অন্যতম নেতা বীরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য।

১৯৩০ সালে ছ'মাস কারাদণ্ড ভোগ করে মুক্তি পাবার পর তিনি আর প্রকাশ্য কোন কাজে যোগ দেননি। গা ঢাকা দিয়ে দলের গোপন কাজেই লিপ্ত ছিলেন। তাঁর নামে একটি গ্রেপ্তারী পরোয়ানাও ঝুলছিল। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নির্মল ভট্টাচার্যের বাড়ীতে গোপন আস্তানা স্থাপন করে সরকারী অর্থ লুণ্ঠনের ব্যবস্থায় মনোযোগ দিলেন।

দলের সদস্য সুবোধ রায় ও বারীন ঘোষকে নির্দেশ দিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া পোষ্টাফিসের টাকা কখন কিভাবে স্থানান্তরিত হয় সন্ধান নিতে। আমাদের দলের অপর এক সদস্য সুবোধ চৌধুরী, তার পিতা ছিলেন সেই পোষ্টাফিসের মাষ্টার। সুতরাং সুবোধ চৌধুরীকে নিয়ে পোষ্টাফিসের ভিতরে যাতায়াত ও খবর নেওয়া সহজ। পোষ্টাফিস থেকে কখন কতটাকা কিভাবে ট্রেজারীতে নিয়ে জমা দেয় সে খবর অনায়াসেই সংগ্রহ করা গেল।

বীরেন ভট্টাচার্যের পরিকল্পনা হল যেদিন মোটা টাকা ট্রেজারীতে জমা দিতে যাবে সেদিন তা ছিনিয়ে নিতে হবে। এই রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিক কাজের জন্য নির্বাচন করলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সুবোধ রায়, বারীন ঘোষ, কুমিল্লার সুবোধ মুখার্জী ও কালীকচ্ছের কানাই দে। শেষোক্ত দুইজন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অপরিচিত, এটাই তাদের নির্বাচনের অন্যতম কারণ। অবশ্য তাদের সাহস ও মনোবল সম্পর্কে নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহ ছিলেন। এই চারজনকে সঙ্গে নিয়ে বীরেন ভট্টাচার্য এ্যাকশনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন।

১৯৩১ সালের ৫ই মার্চ সুবোধ রায় সুসংবাদ নিয়ে এল, সেদিন ট্রেজারীতে জমা পড়বে পঞ্চাশ হাজার টাকা। খবর পেয়েই গোপন আস্তানায় সাজ সাজ রব পড়ে গেল। বিচিত্র পোশাক পরলেন সকলে। একজন সাজলেন মুসলমান, একজন কৃষক ও একজন মজুর। তারপর সঙ্গে নিলেন লাঠি, ছোরা ও একটি রিভলভার। কে কোথায় দাঁড়াবে, কে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে প্রথম আঘাত করবে, কে টাকার

ব্যাগটি ছিনিয়ে নেবে, তারপর কে পশ্চাদ্ধাবনকারীদের বাধা দেবে ইত্যাদি খুঁটিনাটি বীরেন ভট্টাচার্য সকলকে বুঝিয়ে দিলেন। বিশেষ প্রয়োজন হলে রিভলভার ব্যবহার করবেন বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য এটাও ঠিক হল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পোষ্টাফিস প্রাঙ্গনে চারজন নিরীহ গ্রাম্য ব্যক্তি সমবেত হল। শহর দেখার জন্য এমন লোক ত হামেশাই আসে। পোষ্টাফিসের পিয়ন ও একজন অফিসার টাকার থলেটি নিয়ে পথে নামতেই অতর্কিতে আক্রান্ত হল। অফিসারটির মাথায় পড়ল ডাণ্ডা, তিনি চীৎকার করে সরে পড়লেন। ভয়াবহ অবস্থা দেখে পিয়নও পালাচ্ছিল, এমন সময় বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য ব্যাগটি হস্তগত করে সকলকেই সরে পড়ার আদেশ দিলেন। পিয়নের চীৎকারে কয়েকজন পথচারী দৌড়ে এল। কিছু লোক বীরেন্দ্র ভট্টাচার্যকে ধরবার জন্য তাঁর পেছনে দৌড়াচ্ছে দেখে তিনি রিভলভারের ফাঁকা আওয়াজ করায় তারা থেমে গেল। ফলে সকলেই যার যার গন্তব্য স্থলে অনায়াসেই পৌঁছে যেতে সক্ষম হল।

আস্তানায় ফিরে গিয়ে ব্যাগটি খুলে কিন্তু নিরাশ হতে হল। পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যাগে ছিল না, ছিল পঁচিশ হাজার; তার মধ্যে প্রায় অর্ধেকই ছিল দশ টাকার নোটের অর্ধাংশ। তখনকার দিনে নিরাপত্তার প্রয়োজনে দশটাকার নোট কেটে একভাগ আগে ও অপরভাগ পরে পাঠানো হত। খণ্ডিত নোটগুলো পুকুরে ফেলে দেওয়া হল।

ব্যাগটি লুণ্ঠিত হবার পর পুলিশ এসেছিল ঘটনাস্থলে এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এটা স্থানীয় গুণ্ডাদের কাজ। অবশ্য পরবর্তী কালে এটা রাজনৈতিক ডাকাতি সন্দেহ করেছিল। কিন্তু অংশগ্রহণকারীদের নাম পুলিশ জানতে পারেনি আমার লেখা কাগজে প্রকাশিত হবার পূর্বে পর্যন্ত। এমনি সংগোপনে সুশৃঙ্খল ভাবে কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য। এই চারজনের তিনজন পরে

বেঙ্গল অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার হয়ে বহু বছর বিনা বিচারে বন্দী ছিলেন। কানাই দে গ্রেপ্তার এড়িয়ে আসামে বাস করতে সক্ষম হয়েছিল।

আমাদের প্রথম এ্যাকশনের সফলতায় আমরা আনন্দিত ও উৎসাহিত হলাম। আর্থিক সমস্যার একটা সমাধান হল, এখন পরবর্তী ধাপের প্রস্তুতি আরম্ভ হল।

॥ অস্ত্র সংগ্রহ ॥

টাকা নিয়ে বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য চলে গেলেন কলকাতায় অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। তিনি সেখানে স্মাগলারদের (Smuggler) সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, সাহায্য নিলেন বিপ্লবী নেতা গিরীন ব্যানার্জী, হরিকুমার চক্রবর্তী, নিবারণ মিস্তিরদের সংগঠনের। এঁদের সাহায্যে কয়েকটি রিভলভার ও কার্তুজ সংগৃহীত হল। এই কাজটিতে বিপদের আশঙ্কা ছিল প্রচুর, অর্থও ব্যয় হয়েছিল প্রচুর। নিজের উপর ঝুলছে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা, আদান-প্রদান করতে হয় সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে। বড় রকমের ঝুঁকি নিয়ে তিনি সংগ্রহ করলেন অস্ত্রশস্ত্র।

কিছু গোপন পথে পাঠালেন আমার কাছে কুমিল্লায়; আমি সেগুলি দিদি সুহাসিনী পালের বাসায় রাখলাম। একটি রিভলভার রাখলাম প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্মের কাছে। বিপ্লবীর কাছে একটি রিভলভার যে কত মূল্যবান প্রিয় সামগ্রী তা লেখায় প্রকাশ করা যায় না। রিভলবার পেয়ে আমি ত খুশি হলামই, প্রফুল্ল ব্রহ্মও খুব খুশি হল। স্বভাবতঃই এখন ইচ্ছে হল এর কার্যকারিতা দেখতে হবে। একটি গুলি ছুঁড়তে না পারলে যে আনন্দটা পুরোপুরি ভোগ করা যাচ্ছে না।

তাই একদিন প্রফুল্লকে নিয়ে আমি চলে গেলাম কুমিল্লার নিকটবর্তী ময়নামতী পাহাড়ে। একটু নির্জন জায়গা দেখে বার করলাম ঐ অমূল্য বস্তুটি। একটি গুলি আমি ছুঁড়লাম, প্রফুল্লকেও

দিলাম একটি গুলি ছুঁড়তে। গুলির শব্দটি খুব আনন্দ দিল আমাদের।

॥ প্রফুল্লর প্রস্তাব ॥

নূতন অভিজ্ঞতায় খুশি মনেই ফিরছি দুজনে ঘোড়ার গাড়ী করে। রাস্তায় প্রফুল্ল জিজ্ঞেস করল এই রিভলভার কি শুধু দেখার জন্যই আনা হয়েছে ? যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে তাকে অনুমতি দিলে সে তখনকার কুমিল্লার জনসাধারণের ঘৃণার পাত্র অত্যাচারী এস. পি. মারে সাহেবকে যথোচিত শাস্তি দিতে পারে। কথাটা শুনে আমি অবাক হলাম! কারণ এ জাতীয় কল্পনা ত আমাদের ছিল না। আমরা জানতাম রিভলভার ব্যবহার করাটা যুবকদের শক্ত হাতেরই একচেটিয়া অধিকার। আজ পর্যন্ত কোন বিপ্লবীদলই মেয়েদের এ্যাকশনে পাঠায়নি। পরিকল্পনা আছে একথাও শুনিনি। বিপ্লবীদের গোপন চিঠি পত্র ও অস্ত্রশস্ত্র বহন করা এবং তা রাখার জন্য মেয়েদের বিপ্লবীদলের সদস্য করা হত। পলাতক বিপ্লবীদের গোপন আশ্রয় আগলে রাখার জন্যও মেয়েদের সাহায্য নেয়া হত। পুলিশকে ফাঁকি দেবার জন্য মেয়েদের সাহায্য খুবই প্রয়োজনীয় ছিল।

এখন দেখছি প্রফুল্ল অনেক এগিয়ে যেতে চায়। সোজা জবাব না দিয়ে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলাম। কিন্তু প্রফুল্ল চুপ করে থাকার পাত্রী নয়, সুযোগ পেলেই প্রশ্নটা তুলে ধরত। আমি তার প্রস্তাব শুনে খুবই ভাবনায় পড়লাম। সত্যি সত্যি যদি প্রস্তাবটিকে বাস্তবরূপ দেওয়া যায় তাহলে ভারতের বিপ্লবীদলের ইতিহাসে একটা নূতন নজীর সৃষ্টি করা যাবে। খুবই আনন্দের ও আশার কথা। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সোজা নয়। পঙ্গুর হিমালয় লঙ্ঘনের স্বপ্ন দেখছি না ত?

প্রস্তাবটি নিয়ে বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করলাম।

প্রফুল্লকে তাঁর গোপন আস্তানায় নিয়ে এলাম। তিনিও দীর্ঘ আলোচনা করলেন। প্রফুল্লের চালচলন কথাবার্তায় তাঁরও ধারণা হল এই মেয়ের অসাধ্য কিছু নেই।

প্রফুল্ল একটা কিছু করার জন্য ব্যস্ত। তার পীড়াপীড়ির ফলে শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে একটা সুযোগ দেবার সিদ্ধান্তই নিলাম। তবে তাকে বলা হল পুলিশ সাহেব মিঃ মারে নয়, ইংরেজের প্রতিনিধি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকেই হত্যা করতে হবে। অত্যাচারের ফলে জনসাধারণ পুলিশ সাহেবের উপর খুবই অসন্তুষ্ট। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটকে মারতে পারলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর আঘাতটা বেশী পড়বে।

প্রফুল্ল শুনে খুবই খুশী হল এবং বলল শীঘ্রই স্কুলে প্রাইজ বিতরণ উৎসবে ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত থাকবে, সেদিন খুব সহজেই তাকে ঘায়েল করা যেতে পারে। পুরস্কার বিতরণী উৎসবটা উদ্দেশ্য সিদ্ধের পক্ষে সুবিধাজনকই মনে হল।

॥ অনেকের আপত্তি ॥

কলকাতায় ফিরে গিয়ে বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য দু'একজন বিপ্লবী নেতার সঙ্গে মেয়েদের এ্যাকশন সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সাধারণ মত হল এরকম দুঃসাহসিক কাজ করার উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি মেয়েদের নেই। ব্যর্থ হবে প্রয়াস। পুলিসের চোখ পড়ে যাবে মেয়েদের উপর। তাদের পরোক্ষ সাহায্যও নেওয়া কঠিন হবে। বিপ্লবীদের কাজের ক্ষতি হবে তার ফলে। এক বিপ্লবী নেতা আমাকে বলেছিলেন অল্পবয়সী মেয়ে একটি ছফুট লম্বা সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়তেই পারবে না। হাত কাঁপবে, রিভলভারটি মাটিতে পড়ে যাবে। চূড়ান্ত কেলেঙ্কারি হবে।

প্রবীণ অভিজ্ঞ বিপ্লবী নেতাদের বক্তব্য শুনে আমরাও থমকে গেলাম। পুনরায় সব ব্যাপারটি বিবেচনা করে দেখে নেওয়াই উচিত মনে

হল। প্রফুল্লকেও আবার ভাবতে বল্লাম, জানালাম উপরোক্ত মতামত। তার জবাব হল ছেলেরা কি সব কাজেই সফল হয়েছে? কেউ কি ব্যর্থ হয়নি? আমরা ব্যর্থ হলেই কেলেঙ্কারী হবে কেন? একটা নূতন আদর্শের নজির ত তুলে ধরা যাবে। আরও জোর দিয়ে বলল, সে কৃতকার্য হবেই, কাঁপবার মত দুর্বল হাত তার নয়।

আমাদের পরিকল্পনা অভিনব ও দুঃসাহসিক। কারও কোন অভিজ্ঞতা নেই, কারও বোধহয় কল্পনাও ছিল না এ জাতীয় প্রয়াসের। সুতরাং উৎসাহ কোথাও পাব না এটা স্বাভাবিক। তবু নানা প্রশ্ন উঠেছে, তাই আরও বেশী সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়া উচিত মনে করলাম। প্রফুল্লকে ধৈর্য ধরতে বল্লাম, পুরস্কার বিতরণী উৎসবটা ছেড়ে দিলেও ভবিষ্যতে একটা সুযোগ পাওয়া যাবেই। আর ভাবতে লাগলাম একা প্রফুল্লকে না পাঠিয়ে আরও একটি মেয়েকে সঙ্গে দিয়ে দিলে বেশী নিশ্চিন্ত হওয়া যায় কিনা।

॥ শান্তির রিভলভার ছোঁড়া ॥

কংগ্রেসের কাজ ও যাতায়াতের ফলে শান্তির মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। আমি প্রায়ই তাঁর বাসায় যেতাম, ক্রমে তাঁর বাসাটি আমার একটি কর্মকেন্দ্রে পরিণত হল। বাসাটি ছিল ফয়জন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের নিকটে, স্কুলের ছাত্রীদের পক্ষে সেখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করাটা খুব সহজ ও সুবিধাজনক ছিল। মেয়েরা আসত সেখানে ছাত্রীসংঘের ব্যাপারে কথা বলার জন্য, গোপনে আলাপ হত পার্টি সংগঠনের বিষয় নিয়ে। শান্তি ঘোষও তখন ছাত্রীসংঘের কাজে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তার মারও সমর্থন উৎসাহ পেত সে কাজের জন্য। কিন্তু স্কুলের পড়া অবহেলা করা চলবে না এ কথা সবসময় স্মরণ করিয়ে দিতেন।

বিভিন্ন কাজের ভেতর দিয়ে শান্তির সাহস, দৃঢ় সঙ্কল্প, দেশের মুক্তির জন্য সব কিছু ত্যাগ করে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্মের সঙ্গে শান্তি ঘোষকেও পাঠাবার কথা ভাবতে লাগলাম। এ নিয়ে প্রফুল্লের সঙ্গে আমি ও বীরেনবাবু আলোচনা করলাম। সেও শান্তিকে সঙ্গে নিয়ে দুঃসাহসিক অভিযানে যেতে রাজী হল, যদিও তার দৃঢ় বিশ্বাস সে একাই ম্যাজিষ্ট্রেটকে চরম দণ্ড দিতে সক্ষম হবে এবং একথা বার বার জোর দিয়ে জানিয়েও দিল। তবু সঙ্গে একজনকে নিলে সবদিক থেকেই সুবিধা হবে এ যুক্তিটা অগ্রাহ্য করল না।

রিভলভার দেখে শান্তির মনের কি ভাব হয় দেখার জন্য একদিন বিকেলে সেই ময়নামতী পাহাড়ে শান্তিকে নিয়ে গেলাম। অবশ্য শান্তির মার কাছে একথা গোপন রাখা হল। ময়নামতীর জঙ্গলে পৌঁছেই রিভলভারটি বের করে শান্তির হাতে দিলাম। রিভলভার দেখে শান্তি লাফিয়ে উঠল, আনন্দ আর ধরে না। আমি কিছু বলার আগেই সে একটি গাছ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। গুলিটা গাছের পাশ দিয়ে চলে গেল, গাছের উপর লাগলে গুলি ফিরে এসে তাকেই আঘাত করতে পারত। একটা দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলাম। আরও দু'একটা গুলি ছুঁড়ে ফিরে এলাম শহরে। আমি যখন তাকে রিভলভারটি আমার কাছে রেখে ঘোড়ার গাড়ী থেকে নামতে বল্লাম সে রিভলভারটি নিয়েই নেমে গেল। বলল যে রিভলভারটি সে হাতছাড়া করবে না। নির্ভয়ে ও খুশিমনে সে রিভলভারটি নিয়ে বাড়ি গেল।

পরদিন যথারীতি বিকেলে আমি শান্তির বাসায় গেলাম। সে খুব আনন্দিত যে একটি অমূল্য রত্ন তার হেপাজতে আছে এবং সেটি তার কাছেই রাখার জন্য অনুরোধ করল। সুযোগ পেয়ে আমি বল্লাম এটা কি শুধু লুকিয়ে রাখারই জিনিষ? এর কি অন্য কোন সার্থকতা নেই? কথায় কথায় প্রফুল্লের প্রস্তাব ও আকাঙ্ক্ষার কথা বলে ফেল্লাম। কথাটা শুনেই সে লাফিয়ে উঠল, বলল তাকেও এমন একটা কাজের সুযোগ দিতে হবে। এ যে দুঃসাহসিক কাজ এবং তার

পেছনে যে অসীম বিপদ ও নির্যাতন আছে সেটা ভেবে দেখতে বলেই সেদিনকার মত প্রসঙ্গটা শেষ করলাম।

এর পর নানা কাজে ও কথাবার্তায় লক্ষ্য করে দেখলাম শান্তিও বৈপ্লবিক কাজের উপযুক্ত।

তবে শান্তি সম্বন্ধে একটা প্রশ্নও দেখা দিয়েছিল। শান্তি নির্যাতন ও কারাবাসের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবে কিনা? শান্তি যেন একটু নরম প্রকৃতির, আদুরে, সৌখিন ও আরামপ্রিয়। শান্তির বাবা যখন মারা যান সে তখন খুব ছোট ছিল। স্বভাবতঃ মার অত্যধিক আদর-যত্ন তাকে একটু আদুরে করে তুলেছিল। তার চেহারায় বা কথাবার্তায় কোমলতার আধিক্য ছিল।

কিন্তু কিছুদিন আলাপ আলোচনা এবং তার কাজকর্ম দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না সে বেশ শক্ত ধাতুতেই গড়া, বিপ্লবী-মনের অধিকারী। বাইরের কোমলতা সত্ত্বেও প্রয়োজন মত রুদ্রাণী হতে আটকাবে না।

সুনীতি যদিও হৈ চৈ করতে ভালবাসত, কিন্তু কাজের কথা বলার সময় তার গম্ভীর প্রকৃতি লক্ষ্য করার বিষয় ছিল। কোন কাজকেই সে লঘুভাবে নিত না। তাকে যে কাজের ভার দেওয়া হত সেটা সুসম্পন্ন হবে এটা স্বতঃসিদ্ধ ছিল। তার দৃঢ় ও সাহসী মনের পরিচয় পেয়েছিলাম প্রতি কাজে।

খবরের কাগজে বিপ্লবীদের কোন এ্যাকশনের খবর বের হলেই সুনীতি বলত, আমাদের পার্টি শুধু ছোরা লাঠি নিয়েই ব্যস্ত, কাজের কাজ কিছুই করতে পারছে না। বিনয়-বাদল-দীনেশের কথা আলোচনা করতে ওর খুব ভাল লাগত, প্রশংসা করত তাদের সাহসের ও ত্যাগের। ওরা যে আমাদেরই বিপ্লবী বন্ধু একথাও বলেছিলাম।

॥ মেয়েদের এ্যাকশনে আগ্রহ ॥

এমনতর নানা আলোচনায় দেখা গেল তখনকার ছেলেদের মত মেয়েদের মধ্যেও বৈপ্লবিক কাজে আত্মনিয়োগ করার প্রবণতা

বেড়ে গেছে। একটা গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত থাকার আকাঙ্ক্ষা স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছিল। অনুশীলন সমিতিও তাদের দলে কাজ করার জন্য মেয়েদের রিক্রুট করছিল। তাদের দলের মেয়েদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পারুল মুখার্জী, উষা মুখার্জী ও প্রতিভা ভদ্র। এঁরা যোগ দিয়েছিলেন নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতিতে আর সেই সমিতির মারফতে তাঁরা ছাত্রীদের মধ্যে কাজ করছিলেন।

আমাদের দলের মেয়েদের মধ্যে বৈপ্লবিক কাজের আগ্রহ বেড়ে গেছে দেখে আমি আমাদের নেতা বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যকে কুমিল্লা আসতে খবর পাঠালাম। তিনি গোপনেই এলেন কুমিল্লায়। পলাতক অবস্থায় তাঁর থাকাখাওয়ার ব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়া হল বঙ্কিম চক্রবর্তী ও ননী রায়কে। আমাদের সব গোপন কাজে এই দুজনের পরিবারের সাহায্য পেয়েছিলাম প্রচুর। বঙ্কিমের মা অন্নপূর্ণাদেবী নিজের সন্তানের মত দেখা শোনা করতেন আমাদের ফেরারী বন্ধুদের। খাওয়া ও থাকার জন্য বঙ্কিমের বাড়ী আমাদের জন্য দিবারাত্রই খোলা থাকত। ননী রায়ের পরিবারের মেয়েরাও সকলে সযত্নে রাখত আমাদের ফেরারী সহকর্মীদের।

বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য এসে দীর্ঘ আলোচনা করলেন মেয়েদের সঙ্গে। কথা বলে তাঁরও ধারণা হল আমরা মেয়েদের সামনের সারিতে অনায়াসেই রাখতে পারি। তাদের পক্ষে এ্যাকশনে যাওয়া সম্ভব। উপযুক্ত বিবেচিত হল বিশেষভাবে প্রফুল্ল, শান্তি ও সুনীতি। তাদের সাহস আছে, শক্ত নার্ভ আছে, পারবে তারা অসাধ্য সাধন করতে।

সুনীতিকে বলা হল যে ছোরা লাঠি নিয়ে আর বসে থাকতে হবে না, এবার আগ্নেয়াস্ত্র হাতে পাবে। প্রফুল্ল ও শান্তির মত সেও প্রস্তাব শুনে খুবই খুশী হল। মনের মত কাজের ডাক সত্যি এবার এল। আর কিন্তু সে দেরী করতে রাজী নয়, যেন সুযোগ পেলে এখনই রিভলভার নিয়ে ছুটে যায়।

—সাত—

৭ই এপ্রিল ১৯৩১, মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্যাডি নিহত হয়েছে বিপ্লবীর গুলিতে। খবরটা উৎসাহ যোগাল সারা বাংলার বিপ্লবীদের, বিশেষ করে আমাদের মেয়ে বিপ্লবীদের। তারা এবার কাজের দিন ক্ষণ ঠিক করে ফেলার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। এত বড় একটা কাজের প্রস্তুতি তাড়াতাড়ি করা যায় না, ধৈর্য ধরতে বললাম তাদের।

বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রস্তাব করলেন প্রফুল্ল, শান্তি ও সুনীতিকে এ্যাকশনে পাঠাবার আগে দেশের নেতাদের, বিশেষভাবে কুমিল্লার জনসাধারণের কাছে তাদের পরিচিতি দরকার। যদিও প্রফুল্ল এবং শান্তি যথাক্রমে ছাত্রীসংঘের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী, তবু তাদের সারা বাংলার জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার সুযোগ হয়নি। এই উদ্দেশ্যে এবং ছাত্রীরা যে আমাদের সঙ্গে চলাফেরা করে বিপ্লবী কাজের কোন পরিকল্পনা নিয়ে নয়, সেটা পুলিশ ও লোকজনকে দেখাবার জন্য কুমিল্লায় ত্রিপুরা জেলার এক ছাত্রসম্মেলনের ব্যবস্থা করা ঠিক হল। সম্মেলন উপলক্ষে মেয়েদের একটা মিলিটারী ট্রেনিং দেবার সুযোগও প্রয়োজনীয় মনে হল।

বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য কলকাতায় গেলেন কুমিল্লা কনফারেন্সে দেশের নেতৃবৃন্দকে আনবার ব্যবস্থা করার জন্য। এই উদ্দেশ্যে, আমিও কলকাতা গেলাম। সেবারই আমার প্রথম কলকাতা দর্শন, আমাকে থাকতে দেওয়া হল মীর্জাপুর ষ্ট্রীটের "অমিয়-নিবাস" হোটেলে। তখনকার দিনে অনেক পলাতক বিপ্লবীদের আস্তানা ছিল এই হোটেলটি।

॥ জেলা ছাত্র সম্মেলন ॥

৬ই মে ১৯৩১ সালে কুমিল্লায় ত্রিপুরা জেলা ছাত্র সম্মেলন আহ্বান করা হল। যেহেতু অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে আমরা

কুমিল্লায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছি, তাই কনফারেন্সকে খুব জাঁকজমক করে সম্পন্ন করার জন্য দলের সভ্যরা ইচ্ছা প্রকাশ করল। সেই অনুযায়ী আমরা সকল ব্যবস্থা করতে লাগলাম। আমাদের দলের বিশিষ্ট সদস্য অসিত গুহ কিছুদিন আগে আততায়ীর হস্তে নিহত হয়েছিল। তাই তার নামে সম্মেলন মণ্ডপের নাম করা হয়েছিল 'অসিত নগর'।

কনফারেন্স উপলক্ষে এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠন করা হল। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন অমূল্যকাঞ্চন দত্তরায়, নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য, বঙ্কিম চক্রবর্তী, জীবন ব্যানার্জী, শশধর দত্ত, শৈলেশ চৌধুরী ও রবি গোস্বামী। তাঁরা স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীকে ট্রেনিং দিলেন। স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর মেজর হল সুনীতি চৌধুরী। বহু ছাত্রছাত্রী আমাদের এই বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। জেলার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ দেখা গেল।

বিপ্লবীদের বন্ধু ও উৎসাহদাতা কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্মেলনের সভাপতি হতে রাজী হলেন। আর যাঁরা যোগ দিতে রাজী হলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, অশ্বিনী গাঙ্গুলী, হরিকুমার চক্রবর্তী, বিমলপ্রতিভা দেবী প্রভৃতি। বাংলার শ্রদ্ধেয় নেতা ও বড় বড় বিপ্লবী নেতারা যোগ দেবেন শুনে সারা ত্রিপুরার ছাত্র-সমাজ অবিরাম খেটেছিল আমাদের সম্মেলনের সাফল্যের জন্য। প্রতি মহকুমার প্রতি স্কুল থেকে ছাত্র প্রতিনিধি আসতে লাগল।

যথাসময়ে সুভাষবাবু, শরৎবাবু ও অন্যান্য নেতাদের কুমিল্লায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিলেন বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য। তাঁর উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল, তাই তিনি ছদ্মবেশে তাদের নিয়ে আসছিলেন।

গোয়ালন্দ ষ্টীমার থেকে নেমে চাঁদপুরে রেলের এক প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসেছিলেন শরৎবাবু, সুভাষবাবু ও অন্যান্য নেতারা। ট্রেনটি

ছাড়বার কিছুক্ষণ আগে একদল ছাত্র কয়লার গুঁড়ো ছুঁড়ে মারল ওই কামরাটি লক্ষ্য করে। অবাক হয়ে গেলেন সকলে। সুভাষবাবু নীরব নির্বিকার। শরৎবাবু ক্ষুণ্ণ ও বিরক্ত। অবশ্যই বিক্ষোভকারীরা ভেবেছিল এভাবে নেতাদের কুমিল্লা যাওয়া বন্ধ করতে পারবে, আমাদের কনফারেন্স পণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। গাড়ী থেকে কেউ নামলেন না, কলকাতা ফিরে গেলেন না।

এই ঘটনা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরে এক পত্রে উল্লেখ করেছিলেন—"মণ্টু, দেশোদ্ধার করবার জন্য সুভাষের দল আমাকে কুমিল্লায় চালান করে দিয়েছিল। পথে একদল শেম শেম বললে, গাড়ীর জানালার ফাঁক দিয়ে কয়লার গুঁড়ো মাথায় গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে প্রীতি-জ্ঞাপন করলে, আবার একদল বারো-ঘোড়ারগাড়ী চাপিয়ে দেড় মাইল লম্বা শোভাযাত্রা ক'রে জানিয়ে দিলে কয়লার গুঁড়োটা কিছুই নয়—ও মায়া। যাই হোক রূপনারায়ণের তীরে আবার ফিরে এসেছি। "The liberated man has no personal hopes" এ সত্য উপলব্ধি করতে আর আমার বাকি নেই। জয় হোক কয়লার গুঁড়োর! জয় হোক বারো-ঘোড়ার গাড়ী!" (সামতাবেড় ৩০ শে বৈশাখ ১৩৩৮—শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ, একাদশ সম্ভার।)

৬ই মে কনফারেন্স উদ্বোধন করলেন সুভাষচন্দ্র বসু। স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর গার্ড-অফ-অনার, কুচকাওয়াজ দেখলেন সব নেতারা। মেয়েদের বাহিনীর মেজর সুনীতি চৌধুরীর চালচলনে ক্ষিপ্রতা, প্যারেড, কম্যাণ্ড দেখে খুবই মুগ্ধ হলেন সুভাষবাবু। আর প্রশংসা করলেন নির্মলেন্দু ভট্টাচার্যের কম্যাণ্ড। এমনকি নির্মলকে কলকাতা গিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে শিক্ষা দেবার দায়িত্ব নেবার আমন্ত্রণও জানালেন।

খ্যাতনামা নেতাদের বক্তৃতা শোনার জন্য প্রচুর জন সমাবেশ হয়েছিল মহেশ প্রাঙ্গনে। কনফারেন্সের অন্যতম আকর্ষণ

গোবরবাবুর ও তার দলের কুস্তি প্রতিযোগিতা, পুলিন দাসের দলের লাঠি খেলার প্রদর্শনী প্রভৃতি দেখার জন্য ভিড় করেছিল সারা জেলার ছাত্রযুবক সম্প্রদায়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য কনফারেন্সের বিস্তৃত রিপোর্ট ও আমাদের ফটো "চুন্টা প্রকাশ" কাগজে ছাপবার ব্যবস্থা করলেন। চুন্টার ডঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য এই কাগজটি পরিচালনা করতেন। ষ্টিভেন্স নিধনের পর প্রফুল্ল, শান্তি ও সুনীতির ফটো ছাপানোর অপরাধে কাগজের ঐ কপিটি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং ঐ কপির জন্য প্রেসটি তল্লাসী হয়। ডঃ ভট্টাচার্যও নানাভাবে নিপীড়িত হন।

চুন্টা প্রকাশ কাগজের ঐ সংখ্যাটি বীরেন্দ্রচন্দ্র দত্তগুপ্তের মারফতে অপ্রত্যাশিত ভাবে সম্প্রতি পেয়েছি। সেই কাগজ থেকে কনফারেন্সের রিপোর্টটি তুলে দিচ্ছি।

চুণ্টাপ্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

ত্রিপুরা জিলা ছাত্র ও ছাত্রী সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন

"ত্রিপুরা জিলা ছাত্র সংঘ ও ছাত্রী সংঘের সমবেত উদ্যোগে সমগ্র ত্রিপুরা জিলার ছাত্রছাত্রী সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন কুমিল্লায় "মহেশ প্রাঙ্গনে" মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরা জেলা ছাত্রসংঘের বিশিষ্ঠ কর্মী স্বর্গীয় অসিতকুমার গুহ নামক যে বালক কিছুদিন পূর্বে আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছে, তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য সম্মিলনীর মণ্ডপের নাম রাখা হইয়াছিল 'অসিত নগর।' অসিত নগরের সাজসজ্জা অতি চমৎকার হইয়াছিল। মণ্ডপ গৃহের অভ্যন্তরে 'সানিয়াৎ সেন' 'ডিভ্যালেরা' 'রাসবিহারী বসু' 'যতীন দাস' 'কানাইলাল' প্রভৃতির ছবি বিশেষ ভাবে জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল।

পাঁচশতের অধিক ছাত্র প্রতিনিধি এবং এক সহস্রাধিক দর্শক সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। এভিন্ন ঢাকা, কলিকাতা, শ্রীহট্ট ও নোয়াখালী প্রভৃতি স্থান হইতে ত্রিপুরার অনেক ছাত্র আসিয়াছিল। সম্মিলনীর নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, হরিকুমার চক্রবর্তী, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, অশ্বিনী কুমার গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী, প্রাদেশিক ছাত্র সমিতির সভাপতি কিরণচন্দ্র দাস, সম্পাদক অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ গুহ ওরফে গোবরবাবু, তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্য বনমালী ও দুর্গাচরণ বসু প্রভৃতি সহ উপস্থিত হইয়া সম্মিলনীর গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। চাঁদপুরে অভ্যর্থনা সমিতির কতিপয় সভ্য, মৌলবী আসরফ্ উদ্দীন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মজুমদার, শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার এবং একদল কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া ট্রেণে কুমিল্লা লইয়া আসেন।

কুমিল্লায় ট্রেণ পঁহুছিবার বহুক্ষণ পূর্ব্ব হইতে নেতৃবৃন্দের সম্বর্দ্ধনার জন্য এবং দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সমস্ত ষ্টেশন এবং ষ্টেশন হইতে 'অসিত নগর' পর্য্যন্ত প্রায় এক মাইল ব্যাপী সুদীর্ঘ রাস্তা জন সমুদ্রে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ষ্টেশনে এত লোক সমাগম হইয়াছিল যে চতুর্দ্দিকে নরমুণ্ড ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাইতেছিল না। ট্রেণ পঁহুছামাত্র ৫১টা বমের শব্দ দ্বারা তাঁহাদের আগমন বিজ্ঞাপিত করা হয়। বিপুল জনসংঘের সমবেত কণ্ঠের 'বন্দেমাতরম' ও 'জয়ধ্বনির' মধ্যে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সভ্যগণ এবং শ্রীকামিনীকুমার দত্ত, শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত—চেয়ারম্যান কুমিল্লা মিউনিসিপ্যালিটি, হলধর দাশ, বিনোদ ব্যানার্জী, ললিতমোহন বর্মণ, জিতেন্দ্র দত্ত, মৌলবী সৈয়দ আজিজুল্লা, মুখলেছর রহমান, আব্দুল মালেক ও অন্যান্য বহু নেতা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া একখানি বারো ঘোড়ার গাড়ীতে লইয়া যান। ছয়টি সুসজ্জিত হস্তী, অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী, দুইশত মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা পাঁচশত কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক, একহাজার শ্রমিক

স্বেচ্ছাসেবক এবং ছয়শত ছাত্রসমিতির স্বেচ্ছাসেবক জাতীয় পতাকা হস্তে অতি শৃঙ্খলার সহিত শোভাযাত্রা সহকারে তাঁহাদিগকে শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার দত্তের আবাস ভবনে লইয়া যায়।

পরদিন ৭ই মে অপরাহ্ণে অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী কর্ত্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন উৎসব সম্পন্ন হয়।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সম্মিলনীর মণ্ডপ 'অসিত-নগরের' দ্বারোদ্‌ঘাটন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। মণ্ডপের ভিতরে তিলধারণের স্থান ছিল না। প্রায় এক হাজার মহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন সঙ্গীত হইলে পর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্মিলনের উদ্বোধন করেন।

তৎপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী তাঁহার সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিলে পর শ্রীযুক্ত হরিকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

সভাপতির ভাষণ পাঠ হওয়ার পর রাত্রি সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত বিখ্যাত পালোয়ান গোবরবাবু তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্য বনমালী ও স্বর্গীয় ভীমভবানীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাচরণ বসুর সহিত দেশীয় ও পশ্চাত্য প্রথায় মল্লক্রীড়া প্রদর্শন করেন।

৮ই মে প্রাতে সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে পর রচনা, আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়।

অতঃপর ত্রিপুরা জিলা ছাত্রী সংঘের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা বিমল প্রতিভা দেবীকে তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিয়া একটি অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়।

অপরাহ্ণে অসিত-নগর প্রাঙ্গনে ত্রিপুরা জিলা ছাত্রসংঘ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও ত্রিপুরা জিলা ছাত্রী সংঘের স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী একত্রে তাঁহাদের নির্ব্বাচিত সভাপতি এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের প্রতি সামরিক প্রথায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। অধিবেশন সমাপ্তির পর কুমিল্লা ছাত্রসংঘের ও ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থান হইতে আগত যুবকবৃন্দ,

ছাত্রী সংঘের মহিলা খেলোয়াড়গণ প্রায় এক ঘণ্টা কালব্যাপী কুস্তি, ভার উত্তোলন, লৌহদণ্ড বক্রকরণ, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা যুযুৎসু এবং অন্যান্য শরীর চর্চ্চার কৌশলসমূহ দেখাইয়া দর্শকগণের প্রশংসা-লাভ করেন।

পরদিন ৯ই মে সকাল ৯টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা পর্য্যন্ত ভারতবিখ্যাত সন্তরণবীর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সাড়ে আট ঘণ্টাব্যাপী অবিশ্রান্ত ভাবে রাণীর দীঘিতে সন্তরণ করেন।

১১ই মে শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী দাস মহাশয়ের শিষ্যগণের লাঠি খেলা ও ছোরাখেলা দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।"

॥ নারীদের বৈপ্লবিক কর্মে সুভাষবাবুর সমর্থন ॥

৭ই মে সন্ধ্যার পর আমাদের পার্টির মেয়েদের সঙ্গে সুভাষবাবুর এক ঘরোয়া বৈঠকের ব্যবস্থা করলাম শান্তি ঘোষের বাড়ীতে। সুভাষ বাবুর সঙ্গে এলেন বিমলপ্রতিভা দেবী। শান্তি, সুনীতি, প্রফুল্ল প্রভৃতি সকল পার্টির মেয়েরাই উপস্থিত ছিল এই বৈঠকে। নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন সুভাষবাবু ও বিমলপ্রতিভা দেবী। উভয়েই বল্লেন মেয়েদেরও সংগ্রাম করতে হবে ছেলেদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। তখন প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম সুভাষবাবুকে প্রশ্ন করল—বৈপ্লবিক কাজে মেয়েদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা সম্পর্কে তাঁর কি মত?

সুভাষবাবু জবাবে বল্লেন,—খুশি হব সামনের সারিতে তোমাদের দেখতে পেলে।

বিমলপ্রতিভা দেবীও এই ধরণের কথা বল্লেন। মেয়েরা খুব খুশী হল। উৎসাহ পেল যথেষ্ট।

পরদিন দুপুরে আমাদের ছাত্র সংঘের অফিসটি পরিদর্শন করতে এলেন সুভাষবাবু। আমাদের সংঘের কার্য বিবরণী, সংগঠনের ইতিহাস, সভ্য সংখ্যা ইত্যাদি খুঁটিনাটি জেনে নিয়ে প্রশংসা করলেন। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এতটা শক্তিশালী হয়েছি দেখে তিনি খুশী হলেন।

কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলেন আমার নিজের পড়াশোনার কথা। পার্টির কাজের জন্য বি, এ পরীক্ষায় হাজির হইনি শুনে তিনি বিস্মিত হলেন।

ছাত্র সঙ্ঘের বিশেষতঃ ছাত্রী সঙ্ঘের মেয়েদের কর্মশীলতার খুবই প্রশংসা করলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বিমল প্রতিভাদেবীর ত্যাগ ও অংশগ্রহণ সারা দেশকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর উপস্থিতি ও আলাপ-আলোচনা আমাদেরও খুব প্রেরণা ও উৎসাহ দিল।

॥ বিমলপ্রতিভা দেবী ॥

কলকাতার এক ধনী অভিজাত পরিবারের কন্যা ও কুলবধূ ছিলেন বিমলপ্রতিভা দেবী। তিনি আমাদের আয়োজিত ছাত্র সম্মেলনে খুব আনন্দের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গে সেটি ছিল তাঁর প্রথম আগমন। তিনি একমাত্র নেত্রী যিনি যাতায়াতের জন্য আমাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিতে অস্বীকার করেছিলেন। তখনকার দিনে তিনি নিজের টাকা খরচ করেই সভা-সম্মেলনে যোগ দিতেন।

প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা পরিচালনার জন্য।

তিনি 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' গঠন করে ও আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শোভাযাত্রা পরিচালনা করার অপরাধে ১৯৩১ সালের ২৬শে জুন তাঁর ছয় মাস কারাদণ্ড হয়।

তিনি কংগ্রেসের কাজের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী দলের কাজেও যুক্ত ছিলেন। ১৯৩১ সালের ২রা অক্টোবর মাণিকতলার ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন। বিপ্লবী দলের প্রয়োজনে ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করার অপরাধে ইতিপূর্বে আর কোন মহিলা ধৃত হননি। মামলা থেকে তিনি

মুক্তি পান, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ডেটিনিউ করা হয় এবং বিভিন্ন জেলে ছয় বছর আটক থাকেন।

মুক্তির পর ১৯৩৮ সালে তিনি 'নিখিল ভারত বন্দী মুক্তি আন্দোলন কমিটি'র সম্পাদিকা নিযুক্ত হন। কমিটির সভাদের মধ্যে ছিলেন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, শান্তি রায়, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, মুজফফর আহ্‌মদ প্রভৃতি। আমিও এই কমিটির একজন সদস্য ছিলাম এবং বন্দী মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

বিমলপ্রতিভা দেবী কনফারেন্সের পর কলকাতা ফিরে এসেও নিয়মিত আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন।

॥ ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা ছাত্র সম্মেলন ॥

কুমিল্লায় আমাদের কনফারেন্সের সাফল্যের পর আগষ্ট মাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা সম্মেলন আহ্বান করলাম আমার স্বগ্রাম কালীকচ্ছে। আলিপুর বোমার মামলাখ্যাত অশোক নন্দীর স্মৃতিতে মণ্ডপের নাম 'অশোক নগর' রাখা হয়েছিল। বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা সতীন সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেছিলেন দেশনেত্রী হেমপ্রভা মজুমদার। সতীন সেনের সহকর্মী বিনয় সেনও উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম ও শান্তি ঘোষের উপস্থিতির কথা ঘোষণা করা হলেও শেষ পর্যন্ত তাদের যোগ না দেওয়াই স্থির হয়েছিল।

খ্যাতনামা নেতাদের উপস্থিতি এবং সার্থক সাংগঠনিক প্রচারের ফলে সম্মেলনে প্রচুর লোক উপস্থিত হয়েছিল। নিকটবর্তী গ্রাম থেকে বহু লোক এসেছিল। মহকুমার প্রায় প্রতিটি স্কুল থেকে ছাত্র প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিল।

সম্মেলন উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কুচকাওয়াজ ও ব্যায়াম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিভিন্ন রকমের ব্যায়াম ও লাঠিখেলা দেখিয়েছিল কুমিল্লা থেকে আগত হাবুল ব্যানার্জী, গোবিন্দ চন্দ্র সাহা,

প্রমোদ সাহা, জিতেন্দ্রজিৎ বর্দ্ধন প্রভৃতি। অন্যতম আকর্ষণ ছিল একটি কুটির শিল্পের প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীর জন্য গ্রামের বহু মহিলা তাদের হাতে তৈরী টেবিল ক্লথ, জামা, রুমাল, বালিশের ওয়ার, পুরনো কালের সাড়ী, নানারকম প্যাটার্নের শেলাই করা কাঁথা এবং কুমোরের তৈরী সুন্দর সুন্দর পাত্র দিয়ে প্রদর্শনীকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছিল। এই প্রদর্শনীর জন্য খুবই সাহায্য করেছিলেন যোগেশচন্দ্র সিংহ, গিরিজা দত্ত প্রভৃতি।

এই কনফারেন্সের সাফল্য আমাদের গ্রামের ছেলেদের মধ্যে খুবই উৎসাহ জাগিয়ে তুলল। পার্টির কাজেরও বেশ সুবিধে হয়ে গেল।

১৯৩১ সালের ৬ই জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কালীবাড়ীর নাটমন্দিরে ত্রিপুরা জেলা যুব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, উদ্বোধন করলেন সিরাজগঞ্জের আসাদুল্লা সিরাজী। হেমপ্রভা মজুমদার, বিপ্লবী নেতা হরিকুমার চক্রবর্তী, সতীন সেন বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সভামণ্ডপের নাম রাখা হয়েছিল "রসুল নগর"।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিমলপ্রতিভা দেবী। তিনি আমাদের অনুরোধ করলেন চাঁদা তুলে দেবার জন্য। তিনি কতগুলো এলব্যামও দিলেন বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করার জন্য। জালালাবাদ যুদ্ধে নিহত বিপ্লবীদের ফটো দিয়ে তৈরী হয়েছিল এই এলব্যাম। অবশ্যই এই এলব্যাম অবৈধ ভাবে প্রকাশিত ও বিক্রীত হচ্ছিল। শান্তি ও প্রফুল্লের কাছে এলব্যামগুলো থাকত। আমরা এগুলো বিক্রি করে কিছু টাকা বিমলপ্রতিভা দেবীর নিকট পাঠিয়েছিলাম।

কিছুদিন পর বিমলপ্রতিভাদেবী পাঠালেন ইন্দুমতী সিংহকে আমাদের কাছে টাকা সংগ্রহের জন্য। ইন্দুমতী সিংহকে নিয়ে আমরা স্থানীয় উকিল মোক্তার অধ্যাপক ব্যবসায়ীদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে অনেক টাকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আমাদের অজ্ঞাতে হঠাৎ

ইন্দুমতী সিংহ ১৪ই ডিসেম্বর রাত্রে কুমিল্লায় পৌঁছান। পরদিনই সকালে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল। তাঁর অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক গ্রেপ্তারে তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন, আমরাও দুঃখিত হয়েছিলাম। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা পরিচালনার জন্য তাঁর সাহায্য ছিল অপরিহার্য।

১৯৩১ সালের ২রা অক্টোবর মাণিকতলা ডাকাতি সম্পর্কে বিমল প্রতিভাদেবীর বাড়ী খানাতল্লাসীর সময় প্রফুল্ল ও শান্তির একটি চিঠি পুলিশের হস্তগত হয়। তারই ফলে একদিন পুলিশ তল্লাসী করল শান্তি ও প্রফুল্লের বাড়ী। জালালাবাদ শহীদদের এলব্যামেরও সন্ধান করেছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল তারা এলব্যাম বিক্রি করছে কিনা?

কিন্তু শান্তি বা প্রফুল্ল কারও বাড়ীতেই আপত্তিকর কিছু পায়নি। প্রফুল্ল ব্রহ্মের বাড়ী তল্লাসী করে ফিরে যাবার সময় একজন পুলিশ অফিসারকে বলতে শোনা গেল—কিছুই নাই, মিছামিছি হয়রানি। অথচ একে গ্রেপ্তার করার কথাও কর্তারা ভাবছেন।

এ খবরটি শুনে খুবই চিন্তিত হলাম আমরা।

কুমিল্লায় বেঙ্গল অর্ডিনান্সে ধর পাকড় শুরু হয়েছে। ললিতমোহন বর্মণ ইতি পূর্বেই গ্রেপ্তার হয়েছেন। অমূল্য কাঞ্চন দত্তও অর্ডিনান্সে ধৃত হল। দলের নেতা সুরেন্দ্র দাসের নামেও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বার হয়েছে। যে কোন সময় আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে সেই আশঙ্কা হয়।

এই অবস্থায় আমাদের পরিকল্পিত এ্যাকশন তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করতে না পারলে নিরাশ হতে হবে। তাই বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যকে খবর দিলাম তাড়াতাড়ি কুমিল্লা চলে আসার জন্য। তিনিও এ্যাকশনের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। এবার শুরু হল প্রস্তুতির পালা।

—আট—

॥ এ্যাকশনের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ॥

নূতন পরিস্থিতিতে আমাদের পূর্বের পরিকল্পনার কিছুটা পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হল। একটি ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যা করাই পার্টির একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না! বীরেনবাবু প্রস্তাব করলেন যে প্রফুল্ল আত্মগোপন করে সংগঠনের কাজ করবে, আরও সদস্য সংগ্রহ করে পরে বৃহত্তর কোন এ্যাকশনে অংশ গ্রহণ করবে। প্রস্তাবটি প্রফুল্ল ব্রহ্মের প্রথমে মনঃপূত হয়নি, কিন্তু পরে আমাদের যুক্তি ও আলোচনার ফলে তা মেনে নিল। সুতরাং সিদ্ধান্ত হল যে শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীই যাবে ম্যাজিষ্ট্রেটকে হত্যা করার জন্য।

শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীকে পরিকল্পনা বুঝিয়ে দেওয়া হল। তারা খুবই আনন্দের সঙ্গে এই প্রস্তাব গ্রহণ করল।

তারপর আমাদের কর্তব্য হল মেয়েদের গুলিছোঁড়া শেখানো, যাতে যথাসময়ে লক্ষ্যভেদ করতে কোন অসুবিধা না হয়। শেখাবেন বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য। কিন্তু প্রশ্ন হল কোথায় কিভাবে এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করা যায়? পুলিশ, অভিভাবক ও জনসাধারণ সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে কাজটি করতে হবে। নানা তথ্য সংগ্রহ করে শহরের নিকটবর্তী কোটবাড়ীই উৎকৃষ্ট ও নিরাপদ স্থান বিবেচিত হল। ওখানে ছোট ছোট পাহাড় ও টিলায় ঘেরা সমতল ভূমি আছে, চারদিকে জঙ্গল, স্থানটি নির্জনও বটে। কোন লোকের সঙ্গে দেখা হবে না, গুলির শব্দও কারও কানে পৌঁছাবে না।

এই নির্জন জঙ্গলা জায়গায় মেয়েদের নিয়ে যাওয়া এক মস্ত বড় সমস্যা। তখনকার দিনে ছেলেমেয়েদের মেলামেশার স্বাধীনতা ছিল না। মেয়েরা কোথাও যেতে চাইলে একজন পুরুষ অভিভাবক সঙ্গে নিত। অপরিচিত ছেলের সঙ্গে মেয়েকে দেখতে পেলে

ভয়ানক বিশ্রী পরিস্থিতি সৃষ্টি হত। আজকালকার ছেলেমেয়েরা কল্পনাও করতে পারবে না সে সমস্যা ছিল কত দুরূহ।

জীবন যাদের কাছে তুচ্ছ, তাদের কোন বাধাই ঠেকাতে পারে না। প্ল্যান করা হল নির্দিষ্ট দিনে স্কুল থেকে প্রফুল্ল শান্তি ও সুনীতি বের হয়ে এসে এক জায়গায় দাঁড়াবে আর সেখান থেকে প্রফুল্লের ছোট ভাই সুধীর ব্রহ্ম ঘোড়ার গাড়ী করে তাদের কোট-বাড়ী নিয়ে যাবে। আমি সাইকেলে তাদের অনুসরণ করব। ঘোড়ার গাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ থাকবে যেন মুসলমান মেয়েরা গাড়ী করে যাচ্ছে। বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য ও সতীশ রায় অনেক আগে অন্য পথ ধরে কোটবাড়ীর জঙ্গলে একটা নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করবে। দূরে ঘোড়ার গাড়ীতে সুধীর ব্রহ্ম বসে থাকবে, ঠিক স্কুল থেকে বাড়ী ফেরার সময় মত সকলেই যেন বাড়ী পৌঁছে যেতে পারে।

নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে আমরা কোটবাড়ীতে সমবেত হলাম। শান্তি ও সুনীতির রিভলভার ছোঁড়া শুরু হল। কিন্তু প্রথমেই সুনীতির দেখা দিল এক সমস্যা! ছোট্ট মেয়ে, ছোট্ট তার আঙ্গুল, তর্জনীটি টানতে পারে না রিভলভারের ট্রিগার। কিন্তু সুনীতি দমে যাবার পাত্রী নয়, মধ্যমা দিয়েই ছুড়ল গুলি। '৩২ বোর ছোট রিভলভারটাই তাকে দেওয়া হয়েছিল। শান্তি অবশ্য '৪৫ বোর রিভলভার অনায়াসেই চালাতে পারল। প্রফুল্লও কিছুক্ষণ একটি রিভলভার চালাল।

গুলিছোঁড়া শেষ হল। আমরা সকলে বসলাম একটা পাহাড়ের মাথায়। সূর্য্য অস্তগামী, নিঃস্তব্ধ বনানী, প্রকৃতির সৌন্দর্য শান্তির মনকে দোলা দিল, সে গাইতে শুরু করল "একা মোর গানের তরী ভাসিয়ে ছিলাম নয়ন জলে.........যা ছিল মোর কল্পমায়া, সে কি আজ ধরল কায়া" ইত্যাদি।

শান্তি খুব ভাল গান গাইতে পারত। সেযুগে আমাদের সভা-সমিতিতে গান করত, অজয় ভট্টাচার্যের দেশাত্মবোধক গান তার

খুব প্রিয় ছিল। সুনীতিও গাইতে পারত, তার নাকে বাঁশীর সুর এনে চমকে দিত সকলকে।

সতীশ রায় বাঁকুড়া মেডিকেল স্কুলে পড়ত। কুমিল্লার পুলিশের অপরিচিত, অধিকন্তু দানবীর মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের আত্মীয়। তাই সে সন্দেহভাজন ব্যক্তি নয়। তার সঙ্গে শান্তি ও সুনীতির পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। ঠিক হল নির্দিষ্ট দিনে সে তাদের দুজনকে ঘোড়ার গাড়ী করে নিয়ে পৌঁছে দেবে ম্যাজিস্ট্রেট ষ্টিভেন্সের কুঠিতে।

সেদিন একটু দেরী হলেও মেয়েরা পৌঁছে গেল অনায়াসেই যার যার বাড়ীতে। একই প্ল্যানে আমরা দুদিন কোটবাড়ী গিয়েছিলাম। পরিকল্পনা মত সবগুলি কাজ হয়ে গেল।

এখন বিবেচ্য হল কবে কখন কিভাবে প্রস্তাবিত দুঃসাহসিক বৈপ্লবিক কাজটি সম্পন্ন হবে। নানা বাধা অতিক্রম করে গোপনে সব কাজ করতে অনেক বেশী সময় লেগে গেছে। আর দেরী করা যায় না। এমন সময় আর এক অপ্রত্যাশিত বিপদ দেখা দিল।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সুবোধ রায় ও বারীন ঘোষ বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের নির্দেশে এসে গেল কুমিল্লায়। তারা দুজনই ডাকলুঠের ঘটনার পর থেকে আত্মগোপন করে আছে, তাদের গ্রেপ্তারের ওয়ারেন্ট আছে। তাদের নিয়ে একটা এ্যাকশন করবার ব্যবস্থা করার জন্যই কুমিল্লায় আনা হল। ১৯৩১ সালের ৯ই ডিসেম্বর দুপুরে বঙ্কিম চক্রবর্তীর বাড়ীর একটা ঘরে এ্যাকশন সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য বারীন ঘোষ, সুবোধ রায় ও আমি মিলিত হয়েছিলাম। বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যও এসে যোগ দেবেন আমাদের সাথে এই কথা ছিল। অপেক্ষমান আমরা দরজায় টোকার দুটো শব্দ শুনে ভাবলাম বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য এসেছেন। সুবোধ রায় দরজা খুলে দিল। দরজা খুলেই দেখা গেল সামনে দাঁড়িয়ে রিভলভার হাতে ডি, আই, বি, সাব-ইন্সপেক্টার হরিদাস বিশ্বাস আর চারদিকে অনেক পুলিশ।

আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হলাম। পুলিশ বাধা দিল না। পালাবার চেষ্টা করতেই কয়েকজন পুলিশ সুবোধ রায় ও বারীন ঘোষকে ঝাপটে ধরল। দুজন ফেরারীর সাথে আমাকে দেখতে পেয়ে কেন গ্রেপ্তার করল না আজও রহস্যময় রয়ে গেছে বন্ধুদের কাছে। সেদিনও সুবোধ রায় জানতে চেয়েছিল কিভাবে আমি পালিয়ে গেলাম। আজ জীবনের সায়াহ্নে সে রহস্য উদ্ঘাটন করাই সমীচীন মনে করছি।

॥ T-16 ॥

কিছুকাল আগে বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য কুমিল্লায় আমাদের ক্লাবের লাইব্রেরীগুলোর জন্য প্রায় চারশ বই কলকাতা থেকে পাঠিয়েছিলেন, দেশাত্মবোধক বইই বেশী। রেলস্টেশনে পার্শেল খালাস করতে গিয়ে জানলাম পুলিশ পার্শেল আটক করেছে, তারা সব বই পরীক্ষা করে দেখবে। এই বই-এর ব্যাপারে আমাকে অনেকদিন কুমিল্লার ডি, আই, বি, ইন্স্পেকটার কালীমোহম কুশারীর সঙ্গে দেখা করতে হয়েছিল।

হঠাৎ একদিন ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে কালীমোহন কুশারী অফিসে আমায় ডেকে জানালেন যে আমাকে বেঙ্গল অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার করার ওয়ারেণ্ট আছে। কিন্তু যদি আমি তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করি তবে আমাকে গ্রেপ্তার করবেন না।

কথাটা শুনে আমি হকচকিয়ে গেলাম। আমাকে হতভম্ব হয়ে যেতে দেখে তিনি বল্লেন, "আমরা বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও সুরেন্দ্র দাসকে গ্রেপ্তার করতে পারছি না, তার জন্য কর্তৃপক্ষ কৈফিয়ৎ চেয়েছে। বীরেনবাবু আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন পুলিশের রিপোর্ট। সুতরাং আপনি যদি তাদের গ্রেপ্তার করতে সাহায্য করেন কিংবা তাদের গতিবিধি নিয়মিত জানান তাহলে আপনাকে গ্রেপ্তার করব না। মাসিক মাইনে ছাড়া মোটা পুরস্কারও পাবেন। এসব

খবর খুব গোপন থাকবে। আপনার রাজনীতির কোন বাধা হবে না।"

আমি ভেবে মতামত জানাব বলে বের হয়ে এলাম। সেই মুহূর্ত্ত থেকে আমার মাথায় ঝড় বইতে শুরু করল। দুটো মাত্র পথ আমার সামনে, আত্মগোপন অথবা গুপ্তচর বৃত্তি গ্রহণ।

আত্মগোপন করলে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ও পরিকল্পিত এ্যাকশন কার্যকর করা প্রায় অসম্ভব হবে। কারণ মেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, গোপনে সব ব্যবস্থা করাও কঠিন হবে। এত চেষ্টা ও আশা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে! নৈরাশ্য ও ব্যর্থতায় জীবন ভরে উঠবে।

যদি গুপ্তচর বৃত্তি গ্রহণ করি বিপ্লবী আমার অপমৃত্যু হয়ে যাবে। খুবই জটিল সমস্যা আমাকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করে তুলল।

একদিন কথায় কথায় শান্তি ঘোষকে বল্লাম, "বন্ধুদের অনেকেই বেঙ্গল অর্ডিনান্সে আটক হয়েছে। যে কোন দিন আমাকেও গ্রেপ্তার করতে পারে, সুতরাং পুলিশের কাজ একটা না নিলে বাইরে থাকতে পারব না, তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।"

শান্তি জবাব দিল, "আমার কাছে রিভলভারটি থাকবে। আপনি পুলিশের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন জানতে পারলে আপনাকে যেন গুলি করতে পারি।"

একটি নাবালিকাও বোঝে পুলিশের কাজ কত ঘৃণ্য। বিপ্লবী তাতে যোগ দিতে পারে না। তবে এখন কি করব আমি?

অনেক ভাবনার পর আমার দেশপ্রেম, বৈপ্লবিক চেতনা, পারিপার্শ্বিকতা, পরিস্থিতি ও পরিচিতজনদের প্রভাব আমাকে সঠিক পথটি বেছে নিতে সাহায্য করল।

মনে পড়ল বিপ্লবী-মহানায়ক রাসবিহারী বসুর কৌশল। একদিকে কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ কর্তাদের কাছে অবস্থা বুঝে তিনি গুপ্তচরের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, অন্যদিকে খোদ বড়লাটকে বোমা মারার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

মনে পড়ল ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়েছিলেন শত্রুবধের জন্য মিথ্যা ভাষণের। "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" কথাটি মনে পড়ে গেল। উদ্দেশ্য সিদ্ধি তথা শত্রু বধের জন্য ছলনা, কপট আচরণ, মিথ্যাভাষণ দোষনীয় নয়।

আমরা বিপ্লবী, নিছক নীতিবাগীশ নই। আমাদের কাছে লক্ষ্যই মুখ্য, উপায় গৌণ। "দি এণ্ড জাস্টিফাইস দি মিনস" (The end justifies the means) আর নীতিবাগিশদের কাছে 'দি মিনস জাস্টিফাই দি এণ্ড' (The means justify the end).

আমি বিদেশী শাসকের গুপ্তচর বিভাগকে বিভ্রান্ত করার জন্য কূট—নৈতিক চাল দিতে প্রস্তুত হলাম। শক্তির লড়াইয়ে আমরা যেমন তাদের পরাজিত করতে চাই, তেমনি বুদ্ধির লড়াইয়েও তাদের পরাজিত করতে হবে।

অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে আমি কোন পথ গ্রহণ করব সে সম্বন্ধে আমার মনে আর কোন দ্বিধা রইল না।

সবদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। কালীমোহন কুশারীকে জানিয়ে দিলাম আমার সম্মতি। স্বভাবতঃই তিনি খুব খুশী হলেন। আমার নাম হয়ে গেল T16. কুশারীর অধীন গুপ্তচরদের এই ভাবে চিহ্নিত করা হত। আমার কাজ হল প্রতি সপ্তাহে একটি রিপোর্ট দিতে হবে। রিপোর্টের বিনিময়ে প্রতি সপ্তাহে টাকা পাওয়া যাবে। রিপোর্টে বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য ও সুরেন দাসের গতিবিধি উল্লেখ করতে হবে।

শুরু হল আমার আর এক অভিনব অধ্যায়।

প্রথম সপ্তাহের রিপোর্ট দিয়ে টাকাটা গ্রহণ করার সময় খুবই দুঃখিত ও অপমানিত বোধ করেছিলাম আজও তা মনে পড়ে।

রিপোর্ট তৈরী করে নিয়মিত পাঠাই, সুরেন দাস ও বীরেন্দ্র

ভট্টাচার্যকে কখনও কুমিল্লায় নিয়ে আসি, আবার কখনও ঢাকায়, কখনও কলকাতায় পাঠিয়ে দিই।

একদিন খবর দিলাম বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য ইউরোপীয় পোশাক পরে প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে কুমিল্লা ষ্টেশনে নামবেন, তখন তাকে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। কুমিল্লার পুলিশ খবর পেয়েছিল বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য ইউরোপীয় পোশাক পরে চলাফেরা করেন। সুতরাং আমার খবর খুবই বিশ্বাস করল।

রাত সাড়ে এগারোটায়, কলকাতার গাড়ী কুমিল্লা ষ্টেশনে থামল, প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলোর দিকে পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি। কিন্তু নামল না তাদের প্রত্যাশিত শিকার। ক্ষুব্ধ হল পুলিশ।

আমি রিপোর্ট দিলাম সে রাত্রেই বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য এসেছেন তবে সাহেবের নয়, মুসলমানের পোশাক পরা ছিল এবং ভ্রমণ করছিলেন তৃতীয় শ্রেণীতে। আমার সৌভাগ্যবশতঃ তাদের অন্য একটি খবরও নাকি ছিল সে সময় বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য কুমিল্লায় পৌঁছেছেন।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে সম্মতি জানাবার পর কালীমোহন কুশারীর সঙ্গে আমার দেখা হত না। একটি নিরীহ লোক আমার সঙ্গে আমার বাসায় দেখা করে রিপোর্ট নিয়ে যেত, টাকা দিত।

একবার একটি ভুল ঠিকানা দিয়ে জানালাম বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য সে বাড়ীতে রাত্রে ঘুমান। পরদিনই সে বাড়ী খানাতল্লাশী হয়ে গেল।

নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে পরিকল্পিত এ্যাকশন সম্পর্কে বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য আমাকে যেতে হল ঢাকায়। সেখানে ছিলাম ধীরেন্দ্র (লালু) সেন ও মণি সেনের বাড়ীতে। বোধ হয় তিন চার দিন ঢাকায় ছিলাম। বাড়ী ফিরে শুনলাম রোজ কালীমোহন কুশারীর পুলিশ আমার খোঁজ নিত, কোথায় গেছি কবে ফিরব এ প্রশ্ন করত।

সাধারণতঃ কুমিল্লা থেকে ঢাকা লোকে রেলেই যায়। কিন্তু বৈপ্লবিক কাজে গোপনীয়তা প্রয়োজন। তাই লালমাই ষ্টেশনে ট্রেন

ধরে চাঁদপুরের ষ্টীমারে ঢাকায় গিয়েছিলাম। খদ্দরের জামা ও ধুতির পরিবর্তে ধার করে মিলের ধুতি ও সিল্কের জামা পরে গিয়েছিলাম। সঙ্গে নিয়েছিলাম এক প্যাকেট সিগারেট। মাঝে মাঝে সিগারেট খাবার ভান করার ফলে সিল্কের জামাটিতে ফুটো হয়ে যাচ্ছে তা খেয়াল হয়নি। জামাটি ফেরৎ দেবার সময় ফুটোগুলো দেখে খুবই লজ্জিত হয়েছিলাম।

কুশারীর সঙ্গে দেখা করে জানালাম যে মামার বাড়ী গিয়েছিলাম। তিনি বল্লেন ষ্টেশনে গোয়েন্দারা নাকি আমাকে কুমিল্লা ছেড়ে যেতে দেখেনি। অধিকন্তু রিপোর্ট করেছিল আমি আত্মগোপন করেছি। তাই কুশারীবাবু খুবই দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিলেন। খাঁচার পাখী উড়ে যায় নি দেখে নিশ্চিন্ত হলেন।

আমার এই খেলা চলেছিল বোধ হয় মাস দুই। বেশীদিন চালাকি ফাঁকিবাজি চলতে পারবে না এ সম্পর্কে আমি খুবই সচেতন ছিলাম। তাই পরিকল্পিত এ্যাকশনটি ত্বরান্বিত করার জন্য সকল চেষ্টাই করতে থাকি। সুবোধ রায় ও বারীন ঘোষ ধৃত হলে বীরেন্দ্র ভট্টাচার্যও আর অপেক্ষা না করে অবিলম্বে এ্যাকশনটি সম্পন্ন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

পরে বেচারী কালীমোহন কুশারী আমার কাজের জন্য নিন্দিত হয়েছিলেন, প্রমোশন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

আমার এই পরিচিতির সুযোগ নিয়েই তিনি কুমিল্লা জেলে বার বার দেখা করে অনেক অনুরোধ করেছিলেন একটা স্বীকারোক্তি করার জন্য।

ডি. আই, বির, গোপন নথিপত্রে আজও হয়ত সযত্নে রক্ষিত আছে কুমিল্লার T16 এর রিপোর্ট।

আর একদিনও দেরী করা চলে না! সুতরাং শান্তি সুনীতির সঙ্গে এ্যাকশনের দিনটি ঠিক করার জন্য কথা হল। স্কুলের পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেছে, তাই পরীক্ষা দেবার জন্য মেয়েরা আগ্রহ প্রকাশ করল।

পরীক্ষা শেষ হবে ১২ই ডিসেম্বর। ১৩ই তারিখ রবিবার, বাড়ী থেকে বের হওয়া যাবে না। তাই ১৯৩১ এর ১৪ই ডিসেম্বর ম্যাজিষ্ট্রেটকে চরম দণ্ড দেবার শুভদিন ধার্য হল।

ঢাকা, কলকাতা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুরে বিপ্লবীদের আঘাতে ব্রিটিশ শাসক স্তম্ভিত, বিভ্রান্ত ও আতঙ্কিত। প্রতিটি জেলাশাসক সন্ত্রস্ত। সতর্ক করা হয়েছে, কড়া পাহারার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাদের রক্ষার। খবর পেলাম কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেটকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, অচেনা লোকের সঙ্গে দেখা করা বারণ, বিনা পাহারায় চলাফেরা বারণ। কুঠিতে গেলেও দেখা পাওয়া কঠিন। আর এক কঠিন সমস্যা। শান্তিকে পুলিশ চেনে, তার বাড়ী তল্লাশীর জন্য পুলিশের খাতায় নামটিও উঠে গেছে। তার পক্ষে সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব।

সুতরাং ম্যাজিষ্ট্রেটকে ধোঁকা দেবার পথ বার করলাম। মেয়েরা ছদ্মনামে একটা দরখাস্ত সঙ্গে নিয়ে যাবে যে তারা কিশোরগঞ্জ থেকে এ শহরে এসেছে সাঁতারের প্রদর্শনী দেখাবার জন্য, তাই ম্যাজিষ্ট্রেটের কৃপাপ্রার্থী। দরখাস্তটি শান্তি লিখে নিল এবং বক্তব্যও ধোঁকা দেবার উপযোগী রাখা হল।

আরও বলে দিলাম তারা দুজনেই যেন বেশ সেজেগুজে যায়। ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে ভালভাবে না সেজে গেলে হয়ত বেয়ারারা কুঠিতে ঢুকতেই দেবে না।

তাদের উপর নির্দেশ ছিল ম্যাজিষ্ট্রেটকে তখন কুঠিতে না পেলে কোর্টেই যেতে হবে তাকে বধ করার জন্য। ১৪ই ডিসেম্বর মিঃ ষ্টিভেন্সকে যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই ধরতে হবে। শান্তি তার মার জন্য চিঠি লিখে রেখে এসেছে এবং ছোট ভাইকে বলে এসেছে দশটার পর যেন মাকে চিঠিটা দেয়, তাতে এই দুঃসাহসিক অভিযানের ইঙ্গিত দেয়া ছিল। সুতরাং বিফল হয়ে বাড়ী ফেরা যাবে না। দশটার মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে।

আরও সিদ্ধান্ত হল যে শান্তি নিয়ে যাবে একটি '৪৫ বোর

রিভলভার আর সুনীতি নেবে '৩২ বোর বেলজিয়াম ওয়েবলি ছোট রিভলভার। ১৪ই ডিসেম্বর কোথায় কখন তারা দুজন মিলিত হবে তাও ঠিক করা হয়ে গেল।

১১ই ডিসেম্বর শুক্রবার রাত্রে আমি শান্তি ঘোষের বাড়ীতে গিয়ে দেখলাম সে পরদিনের ইতিহাস পরীক্ষার জন্য খুব মনোযোগ দিয়ে পড়া মুখস্থ করছে। দুদিন বাদে যে মেয়ে একটি সাহেবকে খুন করতে যাবে—অভিনব ইতিহাস সৃষ্টির দায়িত্ব যে নিয়েছে—সে নির্বিকার চিত্তে স্কুলের পরীক্ষার পড়ায় মগ্ন! বিস্মিত হলাম, কিন্তু খুশীও হলাম এই ভেবে যে তার শক্ত স্নায়ু ব্যর্থ হবে না কোন পরীক্ষাতেই।

আমার সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম এক শিশি পটেশিয়াম সাইনাইড। প্রয়োজনমত ব্যবহার করার জন্য এই শেষ অস্ত্রটি সাথে রাখত বিপ্লবীরা। তাই শান্তি ও সুনীতিকে দেবার জন্য এনেছিলাম পটেসিয়াম সাইনাইড।

শান্তি আমার প্রস্তাবটিকে হেসেই উড়িয়ে দিল আর বল্ল—"আমাদের উপর বিশ্বাস রাখুন, আমরা সফল হবই।"

১২ই ডিসেম্বর মনীন্দ্রলাল চৌধুরীর মারফতে রিভলবার কার্তুজ পাঠিয়ে দিলাম শান্তির কাছে।

॥ ষ্টিভেন্স বধ ॥

এল ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৩১ সোমবার।

বেলা দশটা বাজে। শহরের ছাত্র-ছাত্রী অফিসের কর্মচারী সকলেই যার যার কর্মস্থলে যেতে শুরু করেছে। সুনীতি চৌধুরী ও শান্তি ঘোষ বাড়ী থেকে বের হয়ে এল স্কুলে যাবার কথা বলে। পূর্ব নির্দিষ্ট জায়গায় সতীশ রায় ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছিল। সুনীতিকে আগে তুলে নিল গাড়ীতে, পরে শান্তির বাড়ীর কাছে এসে শান্তিকেও তুলে নিল গাড়ীতে। ঘোড়ার গাড়ীকে যেতে বলা হল ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠির দিকে, যাবার পথে

তাদের দুজনকে একটিবার দেখে নেবার জন্য আমি দাঁড়িয়ে রইলাম ধর্মসাগরের পাড়ে।

গায়ে সিল্কের চাদর, জামার ভিতরে আগ্নেয়াস্ত্র, একটু পরেই বিরাট একটি বপুর সামনে দাঁড়াতে হবে ঐ ছোট্ট দুটি মেয়েকে। কিন্তু একটুও ভয় নেই তাদের, বেশ গল্প করছে ও হাসছে যেন সেজেগুজে পিকনিকে যাচ্ছে। আমাকে দেখে হাসতে লাগল, ভাবখানা এই একটু পরেই বিজয় পতাকা উড়িয়ে দেব।

ঘোড়ার গাড়ী ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠির সামনে পৌঁছতেই সতীশ রায় সরে পড়ল। তারপর কি ভাবে কাজটি সমাধা করল সে সম্পর্কে সুনীতি বলছে তার স্মৃতিচারণে—

"বিনা বাধায় বারান্দা পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। এবারে এক আর্দালীর সাক্ষাৎ মিলল। ইণ্টারভিউ স্লিপ নিয়ে ভিতরে গেল সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে এল বাঙ্গালী এস. ডি. ও. সহ স্বয়ং শ্বেতকায় মিঃ ষ্টিভেন্স। আমাদের হাতে একটা দরখাস্ত ছিল, দেখল ভাল করে। দেখেশুনে বল্ল ফয়জন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মিস বিশ্বাসের কাছে যেতে। তিনিই আমাদের সবরকম সাহায্য করতে পারবেন সাঁতারের ক্লাব গড়তে। বলা বাহুল্য দরখাস্তটা ছিল সাঁতারের ব্যাপারে অনুমতি চেয়ে—এ ছলনা মাত্র।

"শান্তি ও আমি দুজনেই কিন্তু কুমিল্লার ঐ ফয়জেন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। ম্যাজিষ্ট্রেট মিস বিশ্বাসকে দেখিয়ে দিল বটে কিন্তু আমাদের ভান করতে হল যেন চিনি না মিস বিশ্বাসকে। আমরা এখানে বিদেশাগত। মিস বিশ্বাস ওদেরই লোক রটনা ছিল, ভাবলাম আমাদের ওখানে পাঠাতে চাইছে স্ক্রিনিং এর জন্য।

"সাহেব আমাদের দরখাস্তের উপর রেফারেন্স লিখতে ভিতরে চলে গেল। এতোটা সময় আমাদের নষ্ট করা উচিত হয়নি। এর মধ্যেই তো কাজ শেষ করবার কথা। প্রমাদ গুণলাম—কি হবে যদি আর

না আসে ? যদি আর্দালীর হাতেই পাঠিয়ে দেয় দরখাস্তটা তাহলে সব পরিকল্পনাই ত ভেস্তে গেল !

"না। আমাদের সকল চিন্তা দূর করে আমাদের সামনে উপস্থিত হল দুজনেই—এস, ডি, ও সাহেবকে সঙ্গে করে শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেট। যদিও আমাদের লক্ষ্য একজন। লক্ষ্য সম্পর্কে আমরা ততক্ষণে সজাগ সতর্ক। লক্ষ্যভেদে একান্ত প্রস্তুত।

"এবার আর মুহূর্ত বিলম্ব হল না। রিভলবার ব্লাউজের ভিতর থেকে বের করে চাদরে ঢাকা হাতে নিয়ে একেবারে উদ্যত। সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আর কথা নয়, ছুটল বুলেট। সাহেব দুজনও ছুটল ঘরের ভিতরের দিকে আর আমাদের পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের পিঠের উপর বেয়ারা আর্দালীর দল, মায় বাগানের মালীরাও বাদ গেল না।

"শুনতে পেলাম এস, ডি, ওর কণ্ঠ, তারস্বরে চীৎকার 'পাকড়ো পাকড়ো'। রিভলবার ছিনিয়ে নিয়ে গরুর দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেল্ল চটপট। তারপর লাথি ঘুষি কিল চড় যত্রতত্র চলল।

'তীক্ষ্ণ ভাবে লক্ষ্য করে চলেছি বাড়ীর সকলের চলাফেরা কথাবার্তা, ঘটনাটা কি ঘটল বুঝতে হবে তো। যখন দরজার ভারী পর্দাটা একটু উড়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পাশের ঘরে কেউ যেন শুয়ে আছে চাদর গায়ে। লোকজনও ঘরে আসছে যাচ্ছে, বড় ধীর পদক্ষেপে, চারদিকে যেন স্তব্ধ ভাব।

"ভাবছি তবে কি সফলকাম, না বিফল ? আহত হলে ডাক্তার আসা, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদির একটা ব্যস্ততা থাকতো। ....জানি, এই কার্যের সফলতার সঙ্গে জড়িত শুধু আমাদের ব্যক্তিগত সফলতা নয়, সমগ্র বিপ্লবী গোষ্ঠীর সাফল্য, সমগ্র নারী জাতির মর্যাদা। আমরা যে 'চ্যালেঞ্জ' নিয়ে এসেছি—মেয়েরাও পারে সফলতার সঙ্গে দৃঢ় হস্তে অস্ত্র ধারণ করতে—কম্পিত না তাদের হৃদয়, তাদের হস্ত। পুরুষেরই শুধু একচেটিয়া অধিকার নয় অস্ত্র

ধারণে।.........পাহারারত পুলিশকেই জিজ্ঞাসা করিনা কেন ?......... জিজ্ঞাসা করতেই মুখ খিঁচিয়ে উঠল—একদম মার ডালা, ফিন পুছতা হ্যায়।.........শোবার আগে একে অন্যকে (আমি ও শান্তি) একবার দেখলাম কোথায় কার কত লেগেছে। সারা গায়ে ব্যথা—যন্ত্রণা, সব ফুলে ফুলে কাল কাল হয়ে উঠেছে তবুও ঘুম এসে গেল।"

(স্মৃতিচারণ—আমাদের ত্রিপুরা।)

বালিকা দুটির উপর পুলিশের অত্যাচার সম্পর্কে এডভোকেট জেনারেল এন, এন, সরকার মামলার সময় বলেছিলেন—"প্রচণ্ড আক্রমণ হয়েছিল.........যারা নিরীহ লোককে খুন করে বালিকাই হউক বা বর্ষীয়সী হউক তারা যেহেতু মেয়েছেলে সেজন্য আদর আশা করতে পারে না। বরং তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে ঘটনাস্থলেই তাদের মেরে ফেলা হয়নি।" (The Statesman, 22.1.32)

"There was assault........people who murdered innocent man, whether they are girls or grown-ups could not be expected to be petted because of their sex. They must be thankful that they were not lynched on the spot" (The Statesman, 22.1.32)

কত বড় উদ্ধত উক্তি! দেহ তল্লাসীর সময় তাদের দুজনের সাড়ী খুলে নেওয়া হয়েছিল, অশিষ্টাচরণ করা হয়েছিল। তার জবাবে এন্, এন, সরকার বলেছিলেন, কলকাতার গঙ্গার ঘাটে যাদের মেয়েরা চান করে কাপড় বদলায়, তাদের পক্ষে অশিষ্টাচরণের অভিযোগ না আনাই উচিত।

এই উক্তির বিরুদ্ধে তখন সকল দেশীয় কাগজেই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল।

এখানে সেই বিখ্যাত দরখাস্তটির নকল তুলে দিচ্ছি।

"To His Majesty, The District Magistrate, Comilla

I am the daughter of a retired police inspector of Dacca. From my early age I was very fond of

swimming and that was gradually by a swimming Club of Dacca. I am so much expert in swimming that last year I got the Ist. prize in the 13 hours' Girls' Endurance Swimming Competition. There are also many prizes and certificates concerning my ability in swimming and coaching. Now it is my only ambition to widespread that swimming culture among the girls of Bengal. With this motive in mind I have decided to travel through the mofussil towns of Bengal. It was my effort that has succeeded in performing a demonstration at Kishoreganj. I hope you have got that information in the newspaper at Mymensingh. I got much help from the Magistrate. He was very kind upon me to go through all my works. It was he who is fully responsible that I have succeeded in starting a girls' endurance Swimming Club at Mymensingh. He also helped me greatly in collecting subscription which is very necessary to my work. Now I am before you with the same purpose. Here at Commilla I wish to start a Swimming Club and if possible to make a demonstration with your Presidentship. I am unknown to this place. It will be difficult on my part to arrange it here without taking other's help. It is also my firm conviction that this sort of efforts cannot be successful without your and govt. officers' help.

May I therefore pray to your honour to be kind enough to help me in my motive and thus give necessary instructions and directions. I have etc.

(SD) Illa sen.
Comilla"

"Head Mistress for favour of suggestion"
(ম্যাজিস্ট্রেটের মন্তব্য)

"আমি ঢাকার একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইনস্পেক্টারের কন্যা। ছোটবেলা থেকেই আমি সাঁতরাতে ভালবাসতাম এবং ঢাকার একটি সুইমিং ক্লাবের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে সাঁতার শিখি। আমি সাঁতারে এত সুদক্ষ যে গত বৎসর ১৩ ঘণ্টা স্থায়ী বালিকাদের সাঁতারের প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলাম। আমার সাঁতার কাটা ও শেখাবার দক্ষতা সম্পর্কে অনেক পুরস্কার ও সার্টিফিকেট আছে। এখন আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা বাংলার মেয়েদের মধ্যে সাঁতারের স্পৃহা ছড়িয়ে দেওয়া। এই উদ্দেশ্যেই আমি বাংলার মফঃস্বলের শহরগুলোতে ভ্রমণ করা ঠিক করেছি। আমার চেষ্টায় কিশোরগঞ্জে একটি প্রদর্শনী সম্ভব হয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই ময়মনসিংহের খবরের কাগজে এই খবর পেয়েছেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে আমি অনেক সাহায্য পেয়েছিলাম। তিনি দয়া করে আমার সব কাজ দেখেছিলেন। তাঁরই জন্য আমি ময়মনসিংহে একটি বালিকাদের স্থায়ী সুইমিং ক্লাব স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। তিনি আমাকে খুব সাহায্য করেছিলেন চাঁদা সংগ্রহ করতে যা আমার কাজের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখন আমি আপনার কাছে সেই উদ্দেশ্যেই এসেছি। আমি কুমিল্লায় একটি সুইমিং ক্লাব স্থাপন করতে চাই এবং সম্ভব হলে আপনার সভাপতিত্বে একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করতে চাই। আমি এখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত। অন্যের সাহায্য ভিন্ন আমার পক্ষে এর ব্যবস্থা করা কষ্টকর। এটাও আমার দৃঢ় বিশ্বাস এসব প্রচেষ্টা আপনার ও সরকারী কর্মচারীদের সাহায্য ছাড়া কৃতকার্য হতে পারে না।

সুতরাং আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি দয়া করে আপনি আমার কাজে সাহায্য করুন প্রয়োজনীয় উপদেশ ও নির্দেশ দিন।"

The Statesman পত্রিকা হতে দরখাস্তটি ও ম্যাজিষ্ট্রেটের মন্তব্য উদ্ধৃত করা হল।

The Statesman পত্রিকা ২২/১/৩২ তারিখে এই দরখাস্ত

সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল—"Daughter of a police officer·······to win the sympathy of the Magistrate. That was the best the composer could think of. 'His Majesty' was not the work of unsophisticated girls, that was done to mislead the Magistrate too simple folks who had come to see him."

['পুলিশ অফিসারের কন্যা'—(এই পরিচয় ব্যবহার করা হয়েছিল) ম্যাজিষ্ট্রেটের সহানুভূতি লাভ করার জন্য। পত্র রচনাকারীর মতলবের মধ্যে এটাই সর্বোৎকৃষ্ট।

'মহারাজ'— সম্বোধন ব্যবহার সরল বালিকার কাজ নয়। এটা করা হয়েছিল ম্যাজিষ্ট্রেটকে প্রতারিত করার জন্য, খুবই সরল লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এই ধারণা জাগাবার জন্য।]

সত্যি সাহেবকে বোকা বানাবার জন্যই আবোল তাবোল লিখেছিলাম। ভুল ইংরেজী ইচ্ছে করেই লিখেছিলাম কিংবা আমার ইংরেজী বিদ্যার দৌড়ই ঐ পর্যন্ত ছিল তা আজ আর ঠিক মনে পড়ছে না। এ দরখাস্তের হাতের লেখা ছিল শান্তির। তবে রচয়িতার হাতের লেখা খসড়াটি বার করার জন্য পুলিশ শান্তির বাড়ী থেকে সব খাতাপত্র নিয়ে গিয়েছিল।

সরকারী উকিল ভূধর দাস আমাকে বলেছিলেন যে দরখাস্তটির খসড়া আমার হাতের লেখা প্রমাণ করতে পারলেই ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা যাবে।

শান্তি সুনীতির গুলিতে মিঃ ষ্টিভেন্স নিহত হওয়ার খবরটা পুলিশকে জানাবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ লাইনে সাইরেন বেজে উঠলো। সারা শহর উৎকর্ণ হয়ে প্রশ্ন করতে লাগল—কি হল, কি ব্যাপার?

ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠি থেকে প্রথমে প্রচারিত হয়েছিল শুধু মিঃ ষ্টিভেন্সের হত্যার সংবাদ। কে বা কারা হত্যা করল সে সম্পর্কে থানায়ও কোন খবর ছিল না। লোকমুখে প্রচারিত হয়েছিল ছুটো

ছেলে মেয়ের পোশাক পরে কুঠিতে ঢুকে ম্যাজিষ্ট্রেটকে হত্যা করেছে। বিপ্লবীদের নূতন ফন্দির খবরে খুশী হল, বিস্মিতও হল কেউ কেউ।

কিন্তু এ বিস্ময় বেশী সময় স্থায়ী হল না। লোকে জেনে গেল ম্যাজিষ্ট্রেটের হত্যাকারী তাদেরই পরিচিত দুটি বালিকা শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী, ফয়জন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম ও সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী, ছাত্রীসঙ্ঘের সেক্রেটারী ও স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর মেজর।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নূতন অধ্যায় শুরু করার গৌরব লাভ করল কুমিল্লার দুটি বালিকা!

সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল এই অভিনব সংবাদ। তরুণ, তরুণীরা, বিপ্লবীরা মেতে উঠল আনন্দে।

"শান্তি ও সুনীতি দুইটি মূর্তিমতী জয়াশিখার মত সেদিনকার ভারতবাসীর মানস-গগনে বিরাজ করছিলেন। মহীয়সী বিপ্লবিনীর অগ্নিস্বপ্নে পরিস্নাত দু'টি বালিকা সেদিন বুঝি আর কাউকে ভীরুর মত থাকতে দিলেন না। কিছু একটা করার তাগিদে তরুণ-তরুণীর মন ক্ষিপ্ত, বৃদ্ধদের সহানুভূতি অবারিত।

"এদিকে সারা বাংলায় সুনীতি চৌধুরী ও শান্তি ঘোষের ছবি সমেত প্যাম্পলেট ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই ছবি ও ইস্তাহারের আগুনছোঁয়া ভাষায় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের আহ্বানে, দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার সংগ্রামে তরুণ-তরুণীদের শরিক হবার আমন্ত্রণ! হাজার হাজার প্যাম্পলেট গভীর রাতে 'বেণু প্রেসে' ছাপা হচ্ছে—আর ভোর না হতেই তা চলে যাচ্ছে বিভিন্ন দলের গোপন কেন্দ্রে, বাংলার শহরে গ্রামে সর্বত্র বিলিয়ে দেবার জন্য।"

(সবার অলক্ষ্যে পৃঃ ৩, ৪)

"যে বাংলাদেশের নারী-সমাজ শত লাঞ্ছনাও মুখ বুজে সহ্য করেন, শত আঘাতেও নীরবে অশ্রুপাত করেন কিন্তু প্রত্যাঘাত করার কথা মনে আনেন না, সেই সমাজের দুটি কিশোরীর একি রণরঙ্গিনী মূর্তি! দ্বিধাগ্রস্তের মনে সেদিন দৃঢ়তা জাগলো। যুব সমাজের চিত্তে জাগলো

চমক, উৎসাহে উদ্দীপনায় তারা দুঃসাহসের পথে পা বাড়াতে প্রস্তুত। ছোট্ট দুটি মেয়ে যেন ধূমকেতুর মতো সমগ্র দেশকে তোলপাড় করে দিয়ে গোটা সমাজের হয়ে শাস্তি বহন করতে কারান্তরালে চলে গেলেন দেশবাসীকে চাঞ্চল্যে ও বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়ে।"

(স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী পৃঃ ১১৬)

তরুণ-তরুণীদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল, আবার নিন্দিতও হয়েছিল এক শ্রেণীর লোকের দ্বারা। কুমিল্লা, চাঁদপুর ও চট্টগ্রামের আদালতে উকিলরা ষ্টিভেন্সের মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করে প্রস্তাব পাশ করেছিল। কুমিল্লার এক খ্যাতনামা উকিলের বাড়ীতে সভা করে এই কাজের জন্য আমাদের নিন্দা করা হয়েছিল।

১৭।১২।৩১ সালের The Statesman পত্রিকা থেকে এ সম্পর্কে আরও উল্লেখ করছি।

"It is a heinous crime and unbecoming of the traditions of Indian womanhood," declared Mr. Vallabbhai Patel, the President of the Congress.

"Condemnation of the murder of Mr. Stevens, the District Magistrate was expressed at yesterday's meeting of the Calcutta Corporation.

"Deploring the outrage, the Mayor (B. C. Roy) said the news that Mr. Stevens was brutally murdered by a Bengali girl was particularly shocking on account of the sex of the alleged assailant."

("এটা একটা ঘৃণ্য অপরাধ এবং ভারতীয় নারীজাতির ঐতিহ্যবিরোধী" বলেছেন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট বল্লভভাই প্যাটেল।

"গতকাল কলকাতা করপোরেশনের সভায় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ষ্টিভেন্সকে হত্যার নিন্দা করা হয়েছে।

"হত্যার জন্য পরিতাপ করে মেয়র (বি. সি. রায়) বলেছেন একজন বাঙ্গালী মেয়ে নিষ্ঠুর ভাবে মিঃ ষ্টিভেন্সকে খুন করেছেন

এ সংবাদ বিশেষভাবে ঘৃণাজনক যেহেতু অভিযুক্ত আক্রমণকারী একজন মেয়ে।)

১৫ই ডিসেম্বরের সম্পাদকীয়তে The Statesman পত্রিকা অভিযোগ করেছিল বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে ৫ই ডিসেম্বর হরদয়াল নাগের এবং সুভাষ চন্দ্র বসুর বক্তৃতায় মেয়েদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবার আহ্বান জানাবার পরোক্ষ ফল কুমিল্লার ঘটনা।

আমি ও বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য সেদিন ১৪ই ডিসেম্বর চন্দ্রকিশোর সরকারের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে সব খবরাখবর নিচ্ছিলাম। শান্তি সুনীতির কৃতকার্যতায় আমরা খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। পরদিন খবর পেলাম আমাদের মহিলা শাখার নেত্রী প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম আত্মগোপন করতে সক্ষম হয়নি, পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে ফেলেছে। প্রফুল্লের অনেক কল্পনা ও আশার এরকম অপমৃত্যু হবে আমরা ভাবতেই পারিনি।

॥ প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম ॥

১৯১৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম কুমিল্লায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল রজনী ব্রহ্ম, মাতা রঙ্গবাসী ব্রহ্ম।

তাঁর পিতা আইন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং পুলিশ কোর্টের মামলায় খ্যাতি লাভ করেছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনে তিনিও যোগ দেন এবং কোর্ট বর্জন করেন।

প্রফুল্লনলিনীর একটি ভাই ও একটি বোন ছিল। ছোট ভাই সুধীর ব্রহ্ম আমাদের বিপ্লবী দলে যোগদান করে এবং বিপ্লবী দলের পুস্তকাদি বাড়ীতে এনে পড়ে। সেই সব পুস্তক পড়ে প্রফুল্লও বিপ্লবী দলের প্রতি আকৃষ্ট হন। তখন তিনি ছিলেন ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টার ফলে কুমিল্লায় আমাদের দলের মহিলা বিভাগ গঠন করা হয়। তাঁরই চেষ্টায় আমাদের দলে অনেক ছাত্রী যোগ দিয়েছিল। ত্রিপুরা জেলা ছাত্রী সংঘ গঠিত হলে তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম।

কুমিল্লার পুলিশ সুপার মিঃ ম্যারের আইন অমান্যকারী স্বেচ্ছা-সেবকদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের ঘটনা শুনে ও দেখে প্রফুল্ল-নলিনী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং প্রতিশোধ নেবার জন্য সঙ্কল্প করেন। মেয়েরাও বৈপ্লবিক কাজের উপযোগী এটা প্রমাণ করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেন। তারই ফলস্বরূপ পরবর্তী কালে শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীর দ্বারা কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেটকে গুলি করে হত্যা করা হয়। পরে গুরুতর বৈপ্লবিক কাজে যোগ দেবেন এরকম প্ল্যান করে তাঁকে বাইরে রাখা হয়েছিল। আত্মগোপন করার উদ্দেশে বাড়ী থেকে পালাবার পথে অপ্রত্যাশিত ভাবে তিনি ধরা পড়ে যান ১৫ই ডিসেম্বর। ষ্টিভেন্স হত্যা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু পুলিশ প্রমাণ অভাবে ষড়যন্ত্র মামলা করতে না পেরে তাঁকে ডেটিনিউ করে এবং ১৯৩২ সালের ৩০ মে হিজলি ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়। জেলে ও ক্যাম্পে থাকা কালে প্রফুল্লনলিনী আই, এ, ও বি, এ, পাশ করেন। ১৯৩৫ সালের ৩রা মে হিজলী থেকে স্বগ্রাম কাকসারে (কুমিল্লা) তাঁকে অন্তরীণ করে রাখে। ১৯৩৬ সালের ১৭ই এপ্রিল কুমিল্লা শহরে তাঁর বাগিচাগাওয়ের বাড়ীতে স্থানান্তর করে অন্তরীণ করে।

অন্তরীণ অবস্থায় তাঁর এপিণ্ডিসাইটিস হয়। কুমিল্লায় অস্ত্রোপচার সম্ভব নয় বলে স্থানীয় ডাক্তারগণ তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেন। পিতার আকুল প্রার্থনা সত্বেও পুলিশ অনুমতি দিল না তাঁকে কলকাতা নিয়ে যাবার। প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে অকালে একটি প্রতিভার অবসান হল।

১৯৩৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী বন্দী প্রফুল্ল চিরমুক্তি লাভ করলেন।

পুলিশের তৃপ্তি তাতেও হয়নি, শ্মশানে যারা গিয়েছিল শ্রদ্ধা জানাতে তাদেরও উৎপীড়ন করতে ইতস্ততঃ করে নি।

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে বিপ্লবিনী প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্মের নাম অবিস্মরণীয়।

—নয়—

॥ গ্রেপ্তার ॥

১৫ই ডিসেম্বর ভোরেই আমাদের দলের অনেক সদস্য গ্রেপ্তার হয়ে গেল। আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য আমার আত্মীয়-স্বজনের সব বাড়ী তল্লাসী হল। পুলিশের হামলা ও অত্যাচার বেড়ে যাওয়ায় শহরে থাকাটা আর নিরাপদ মনে হল না। আমি ও বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য হেঁটে লালমাই ষ্টেশনে গিয়ে রেলগাড়ী চাপবার পরিকল্পনা করলাম। কুমিল্লা ষ্টেশন গুপ্তচররা ঘিরে রেখেছে, সেখানে যাবার উপায় নেই।

আমরা রাত্রের অন্ধকারে চন্দ্র সরকারের বাড়ী থেকে রওনা হবার সময় খবর পেলাম সুনীতির নাকি মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তারা তুজনেই কথা বলছে বেশী, গান করছে বেশী, তাদের অস্বাভাবিক ব্যবহার। ডাক্তার জেলখানায় গেছে তাকে পরীক্ষা করতে। লালমাই-এর পথে যেতে যেতে নানা ভাবনা চিন্তা মনে জাগল। সুনীতিকে যে রিভলভারটি দিয়েছিলাম, তাতে একটি safety lock ছিল। হয়তো ভুলে সেটা খুলে দিইনি, গুলি বের হয়নি, তাই হতাশায় সে ভেঙ্গে পড়েছে। যদিও জানি, ভাল ভাবেই জানি, সুনীতি খুব শক্ত ধাতুতে গড়া, নুইয়ে পড়ার পাত্রী নয়, তবু আমার খুব অস্বস্তি লাগছিল। সঠিক সংবাদটা জানবার জন্য আমি ফিরে এলাম কুমিল্লায় লালমাই ষ্টেশন থেকে। পরিকল্পনা মত বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য চলে গেলেন।

লালমাই থেকে ফিরে রাত্রেই গেলাম লেডি ডাক্তারের বাড়ী। তিনিই জেলে গিয়েছিলেন বন্দী তুজনকে দেখতে। তাঁর বাড়ির লোকেরা আমার পরিচিত। তাঁর ছেলের কাছে আমার উপস্থিতির খবর শুনে তিনি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়লাম।

তারপর গেলাম আমাদের হিতৈষী কংগ্রেস নেতা ও খবরের কাগজের রিপোর্টার ফণী নাগের বাড়ী। মুসলমানের পোশাক পরা থাকলেও ফণী বাবু আমাকে চিনতে পেরে ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তায় এলেন কথা বলার জন্য।

তাঁর কাছে শুনলাম সুনীতি সম্পর্কে গুজবটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। শান্তি-সুনীতি দুজনেই আনন্দে জোর গলায় দেশাত্মবোধক গান করছে, খুব খুশী তারা। তাদের আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখে জেলার বাবু ভেবে নিয়েছিল ওসব বিকৃত মস্তিষ্কের লক্ষণ এবং তদনুসারে ডাক্তারকে খবর দিয়েছিল। সত্যিই ত এমন একটা ঘটনার পর ছোট দুটি মেয়ের মাথার গোলমাল হতে পারে এটা সাধারণ মানুষ ভাবতেই পারে।

তাদের প্রথম দিনের আচরণ উল্লেখ করা হয়েছিল আদালতে বিচারের সময়। এ বিষয় ২২।১।৩২ তারিখের The Statesman পত্রিকার রিপোর্ট এখানে তুলে দিচ্ছি।

"The Magistrate who recorded their statements deposed that they were quite at ease when he saw them. They were anxious to tell the whole world that they had succeeded in killing the Magistrate. They were in a mood of triumph and of defiance ....They were then so cool and collected that after the statements had been recorded, they put cross lines on the blank spaces and wrote their names twice."

(যে ম্যাজিষ্ট্রেট তাদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করেছিলেন তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তারা খুবই শান্ত ছিল যখন তিনি তাদের দেখেছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটকে হত্যা করতে সফল হয়েছে একথা সারা পৃথিবীকে জানাবার জন্য তারা উদ্‌গ্রীব ছিল। বিজয়ীর মত উদ্ধত মেজাজে তারা ছিল.........তারা তখন এত শান্ত ও স্থির

চিত্ত ছিল যে বিবৃতি লিপিবদ্ধ করার পর তারা ফাঁকা জায়গাটি রেখা টেনে কেটে দিয়ে দুবার তাদের নাম লিখেছিল।)

শান্তি ও সুনীতির খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু শহরে পুলিশের তাণ্ডব দেখে পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। দিনের বেলা কোন হিতৈষীর বাড়ীতে গোপন ভাবে থাকি এবং রাত্রে নানা রকম পোশাক পরে ঘোরাঘুরি করি।

একদিন রাত্রে গেলাম দুর্গামঠে প্রমথ নন্দীর সদ্যজাত মেয়ে ইলাকে দেখার জন্য। কাকীমা চপলা নন্দী তাঁর রান্না একটু গরম ভাত খেয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে রাজী হয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে বড় রাস্তায় পড়েই দেখলাম উল্টোদিক থেকে একদল পুলিশ মার্চ করে আসছে। পালাবার চেষ্টা না করে তাদের সম্মুখীন হলাম। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গেলাম। হাতে বিড়ি, পরনে লুঙ্গি, পুলিশের সন্দেহ হল না। কিছুদূর গিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম পুলিশ দুর্গামঠেই ঢুকছে। পরে জেনেছিলাম খবর পেয়ে পুলিশ আমাকেই ধরতে এসেছিল। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে গেলাম।

এরপর কুমিল্লা শহর ত্যাগ করাই ঠিক করলাম। পরদিন হেঁটে লালমাই ষ্টেশনে গিয়ে একটি আশুগঞ্জের টিকিট কেটে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় এককোণে সিট দখল করে বসলাম। গাড়ী কুমিল্লা ষ্টেশনে থামামাত্র পুলিশ ও গুপ্তচর প্রতি কামরা অনুসন্ধান করল। সৌভাগ্যবশতঃ মুসলমান পোশাকী আমাকে কেউ চিনতে পারল না। কিন্তু বিপদ দেখা দিল আখাউড়া ষ্টেশনে. জংশন ষ্টেশন, গাড়ী সেখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। গোয়েন্দা প্রমোদ চক্রবর্তী কুমিল্লায় আমাকে সর্বদা নজরে রাখত তাকে দেখলাম অনুসন্ধানের জন্য কামরাটিতে উঠতে। সে একবার আমার দিকে চেয়ে ঠিক চিনতে না পেরে চলে গেল। কি ভেবে কিছুক্ষণ পর আবার আমার কাছেই এসে উপস্থিত

হল। জানতে চাইল কোথা থেকে এসেছি, টিকিটও দেখল, তার পরই তাড়াতাড়ি ট্রেন থেকে নেমে গেল। আমাকে চিনতে পেরেছে সন্দেহ করে আমিও উল্টোদিকের দরজা দিয়ে নেমে পড়লাম পাশের গ্রামে ঢুকে আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে। আমার পরিচিত লোক সেই গ্রামে ছিল। ইতিমধ্যে প্রমোদ চক্রবর্তী তার দলবল নিয়ে 'চোর' 'চোর' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে আমাকে ধাওয়া করল। অন্ধকারে দৌড়ে গ্রামের রাস্তা ভুল করে ঢুকে পড়েছিলাম রেলের কোয়ারটারে। আটকে গেলাম এক কানা গলিতে। ধরা পড়ে গেলাম। উত্তম মধ্যমও জুটল।

আমি লুঙ্গি পরেছিলাম আর মাথা ও মুখ ঢেকে রেখেছিলাম লম্বা উলের টুপিতে। তবু আমাকে চিনতে পারল গোয়েন্দা প্রমোদ চক্রবর্তী। এই গোয়েন্দা কুমিল্লায় আমাকে নিয়মিত অনুসরণ করত, পাহারা দিত ও ভালভাবেই চিনত।

আখাউড়া থেকে নিয়ে এসে সেরাত্রে আমাকে রাখল কুমিল্লা কোতোয়ালিতে। পুলিশের খিস্তি ও অশ্লীল গালাগালি আমাকে ঘুমোতে দেয়নি সারারাত। পরদিন বেলা দশটায় কোমরে দড়ি বেঁধে হাঁটিয়ে নিয়ে চল্ল আমাকে ডি, আই, বি, অফিসে। রাস্তায় পুলিশের কাছে শুনলাম সেই অফিসের একটা ঘরে কম্বল ধোলাই দেবার ব্যবস্থা আছে। সেখানেই আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম এবার কুশারী এক হাত নেবে। চরম শাস্তির জন্যই প্রস্তুত, সুতরাং কম্বল ধোলাই ? "ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।"

দুপুরে ডি, আই, বি, ইনস্পেক্টার কালীমোহন কুশারীর কাছে নিয়ে হাজির করল। আমাকে তিনি প্রথমেই বল্লেন—"আমরা এ জাতীয় ঘটনা আশঙ্কা করেছিলাম। তবু আপনাকে ও বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করতে পারিনি। আজ তার জন্য আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। আমাকে খুব জব্দ করেছেন আপনি। যা হবার হয়েছে। মামলা হবেই এবং আপনার মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য। যদি বাঁচতে চান এবং

জীবনে উন্নতি করতে চান আমাকে সাহায্য করুন, আপনাকে বিলেতে থাকা ও পড়াশুনার সব ব্যবস্থা করে দেব! দুদিন পর জেলে আপনার সঙ্গে দেখা করব, আপনি ভেবে দেখুন! আপনার উপর কোন অত্যাচার না করার নির্দেশ দিয়েছি, একটু পরেই আপনাকে জেলে পাঠিয়ে দেব।"

মিষ্টিকথা ও অপ্রত্যাশিত ভালব্যবহার কুশারীর কাছ থেকে পেয়ে বিস্মিত হলাম। তবে সবই উদ্দেশ্যমূলক বুঝতে অসুবিধা হল না।

দুদিন পর কালীমোহন কুশারী এলেন জেলে দেখা করতে। অনেক সদুপদেশ, আশার বাণী, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি সামনে ধরে তুল্লেন। আমি তাকে সাহায্য করতে পারব না বলায় তিনি আমার জন্য খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন। ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই তিনি বল্লেন যে আমার গায়ের জামা ও পরনের ধুতি খুলে দিতে, তার বদলে তিনি নূতন জামা ও ধুতি দিয়ে যাবেন। পরে জানতে পারলাম আমার জামা ধুতি এবং শান্তি সুনীতির গায়ের চাদর একই ধোপার কাচা কিনা মেলাবার জন্য এইব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু আমার কাপড়ে কোন ধোপার দাগ ছিল না। আমি জেলে গিয়ে হঠাৎ কি মনে করে ঐ দাগগুলো কেটে ফেলেছিলাম। এই দাগ মিলে গেলে ষড়যন্ত্র মামলার সুবিধে হত কিনা জানি না। তবে এটা ঠিক যে একই ধোপার কাচা ছিল আমার গায়ের জামা ও তাদের গায়ের চাদর। পুলিশ আমার গ্রামে গিয়ে নানা লোকের কাছে খোঁজ নিয়েছিল শান্তির গায়ের চাদরটি আমাকে ব্যবহার করতে দেখেছিল কিনা। চাদরটির উপর খুব গুরুত্ব দিয়েছিল।

॥ কুমিল্লা জেল ॥

জেলে গিয়ে সঙ্গী পেলাম আমাদের দলের ভুবন বর্দ্ধন, ননী রায়, বঙ্কিম চক্রবর্তী, মনীন্দ্রলাল রায়চৌধুরী, সমরেন্দ্র নন্দী, বিনয় নন্দী, অন্নদা দাস, শিশির চৌধুরী প্রভৃতি।

আইন অমান্য আন্দোলনে ধৃত বন্দীও কয়েকজন ছিল, তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হরদয়াল নাগ ও ডাঃ নৃপেন বসু। এই দুজনকে পেয়ে আমরা সকলেই খুশী হয়েছিলাম।

হরদয়াল নাগ পরম অহিংসবাদী নেতা। তিনি আমাদের ঘৃণা করবেন আশঙ্কা করে আমি তাঁকে এড়িয়ে চলব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি প্রথম দিনই আমাকে ডেকে ষ্টিভেন্স হত্যার কথা ও শান্তি-সুনীতির কথা বিস্তৃত ভাবে জানতে চাইলেন। সব শুনে শান্তি-সুনীতির দেশপ্রেম ও সাহসের প্রশংসা করলেন। তিনি খুশীই হয়েছিলেন আমাদের কাজে। তাঁর কথাবার্তায় এটুকু আমি বুঝতে পেরেছিলাম। প্রায়ই নানা কথাবার্তায় শান্তি সুনীতির প্রসঙ্গ তুলতেন।

ডাঃ নৃপেন বসু সম্পর্কে আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আমরা তাঁকে পেয়ে খুবই উপকৃত হয়েছিলাম, এই নিরলস ত্যাগী কর্মীকে আমাদের অভিভাবকের স্থানে বসিয়েছিলাম। তিনি আমাদের সকলের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।

কিছুদিন পর ডি, আই, বি, ইনস্পেকটার কালীমোহন কুশারী আমার জেলে এলেন। তিনি জানাতে এসেছেন তাঁর কথা না শুনে আমি খুব ভুল করেছি। এবার অনুতাপ করতে হবে। ষড়যন্ত্র মামলার সব বাধা নাকি দূর হয়ে গেছে। শান্তির মার কান্নাকাটি অনুরোধ ও চাপে শান্তি স্বীকারোক্তি করেছে। শুধু এই সংবাদটি দেবার জন্যই তাঁর আগমন। এটা বহু পুরনো পুলিশী কৌশল। বল্লাম তাহলে এবার আপনার প্রমোশন অনিবার্য। বিরক্ত হলেন অপ্রিয় কথাটি শুনে।

পরদিন জেল পরিদর্শনে এসেছিলেন এস. ডি. ও. নেপাল সেন ও সরকারী উকিল ভূধর দাশ। শান্তি সুনীতির গুলি এড়াতে সক্ষম হয়ে বেঁচে গেছেন নেপাল সেন। তাঁর সামনে ভূধর দাশ আমাকে বল্লেন—

"৩০২ ধারায় গ্রেপ্তার হয়েছ, এবার আর রক্ষে নেই। কেন যে একাজ করলে ভেবে পাই না।"

নেপাল সেন অন্যদিকে চলে গেলে পর ভূধর দাশ চুপিচুপি আমাকে জানালেন, "পুলিশ মামলা দায়ের করার মত কিছুই পায় নি, ষড়যন্ত্র মামলা হবে না। কোন চিন্তা করো না।"

ভূধর দাশের কথা পূর্বেও বলেছি। যদিও সরকারী খ্যাতনামা উকিল তবু আমাদের তিনি খুবই স্নেহ করতেন, তাঁর কাছে চাঁদা চেয়ে নিরাশ হইনি কখনও, সব জনকল্যাণমূলক কাজেই তিনি সাহায্য করতেন। তিনিই আমাকে সেদিন বলে গেলেন শান্তির খাতাপত্র সব তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করেও আমার হাতের লেখা দরখাস্তের খসড়া পায় নি।

কুমিল্লা জেলে দেখা হল কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীর সঙ্গে, তাঁরা আইন অমান্য করে এসেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার পর শহরের প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনার সময় জানতে পারলাম ছাত্রছাত্রীরা আনন্দিত, যুবকরা গর্বিত। এ ত স্বাভাবিক! কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দুটো মত দেখা দিয়েছে। একদল বলছেন ষ্টিভেন্স ভাল লোক ছিল, তাকে হত্যা করা ঠিক হয় নি। উকিলরা ত শোক ও নিন্দার প্রস্তাব নিয়েছে। সত্যি ষ্টিভেন্স দক্ষ ইংরেজ প্রতিনিধি ছিল। দক্ষতার জন্য তাকে কমিশনার পদেও উন্নীত করা হয়েছিল। লোকও নাকি ভাল ছিল। শাসক শ্রেণীর কৃতী ও ভাল কর্মচারীর জন্য দুঃখের কারণ বুঝলাম না। অন্যদল বলছে আমি একটি কাপুরুষ, তাই বালিকা দুটিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে নিজে পালিয়ে গেছি এবং সর্বনাশ করেছি দুটো মধ্যবিত্ত পরিবারের।

ছাত্র আন্দোলনে প্রফুল্ল ব্রহ্ম, শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীদের সঙ্গে আমি কাজ করেছি। তাদের সঙ্গে আমার সাহচর্য্য আমাকেই সমালোচনার লক্ষ্য করেছে। যদিও লোকে জানত এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে একটা দলের প্রচেষ্টা রয়েছে, তবু আমাকেই ধিকার দিয়েছে।

ষড়যন্ত্রে জড়িত বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্যদের নাম তখনও অজ্ঞাত ছিল।

পরিবার দুটো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, নিপীড়িত হয়েছে এটা সত্য। স্বাধীনতার সংগ্রামে এটা ত স্বাভাবিক। চট্টগ্রামে বহু পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। এ ত কুমিল্লার লোকের অজানা নেই। পরবর্ত্তী কালের দুটো ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য।

মুক্তির পর কলকাতা পৌঁছেই শান্তির মার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি তখন সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকতেন। বিকেলে গিয়েছিলাম, তিনি তখন বাড়ী ছিলেন না। দেখা হল শান্তির ছোট বোন অমির সঙ্গে। তার মার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি শুনে অমি খুবই বিস্মিত হল। বলল, "অখিলদা, মা আপনার উপর এখনও রেগে আছেন, অভিশাপ দেন সুযোগ পেলেই। আপনাকে দেখলে ক্ষেপে যাবেন।" তবু আমি অপেক্ষা করলাম। একটু পরেই তিনি এলেন।

"মাসীমা কেমন আছেন?" বলেই প্রণাম করলাম। চোখের কোণে জল দেখা গেল, তবু সাদরেই আমাকে গ্রহণ করলেন। মামুলি কথা হল।

কিছুদিন পর যখন আবার দেখা হল তখন তিনি ক্রোধ প্রকাশ করলেন। বললেন, "তোমাকে নিজের পরিবারের ছেলে মনে করতাম ও বিশ্বাস করতাম, তাই শান্তিকে মিশতে দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি শান্তির হারটা চুরি করলে। টাকার দরকার ছিল বল্লে আমি টাকা দিতাম। তারপর এরকম একটা সর্বনেশে কাজ আমাকে একটুও বুঝতে দিলে না। যাক আমার অদৃষ্ট! এখন আর বলে কি হবে?"

"মাসীমা পুলিশ আপনার বাড়ী খানাতল্লাশী করার পর আপনি বলেছিলেন পরীক্ষার আগে যেন শান্তিকে বিপদে না ফেলি। তাই পরীক্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম।"

সত্যি মাসীমা আমাকে খুব স্নেহ করতেন। সময়ে অসময়ে তাঁর

বাড়ী যেতাম, খেতাম, গল্প করতাম ও লুডো খেলতাম। মাসীমা লুডো খেলা ভাল বাসতেন তাই মাঝে মাঝে রাত্রে শান্তির পড়া শেষ হলে খেলতে বসতাম আমরা চারজন—শান্তি, শান্তির ভূপেনদা, মাসীমা ও আমি। শান্তি বিপ্লবী সুতরাং লাল গুটির প্রতি তার আগ্রহ থাকত বেশী। শান্তিরা পূজার ছুটিতে কলকাতা বেড়াতে গেল, যাবার সময় বাড়ীর চাবিটি দিয়ে গিয়েছিল আমাকেই। সে সময় ঐ বাড়ীতে আমাদের সব রিভলভার রাখতাম। একদিন আমি ও মনীন্দ্রলাল চৌধুরী সে বাড়ীতে রিভলভার নাড়াচাড়া করছিলাম। হঠাৎ একটা রিভলভার থেকে একটি গুলি ছুটে গেল। মনীন্দ্রলাল চৌধুরী আশ্চর্যজনক ভাবে সেদিন বেঁচে গেল। একটা মস্তবড় বিপদ থেকে রক্ষা পেলাম।

পার্টি গড়ার জন্য মাসীমার পরোক্ষ অবদান আজও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

মহাত্মা গান্ধীজীর চেষ্টায় অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে শান্তি-সুনীতিও ১৯৩৯ সালে মুক্তি পেল। আমরা খুবই আনন্দিত হলাম। একদিন বিমলপ্রতিভা দেবীর বাড়ীতে দুজনকেই অভ্যর্থনা জানানো হল।

সুনীতি তখন তার মা বাবার সঙ্গে থাকত ভবানীপুরে স্কুলরোর একটা বাড়ীতে। ঐ বাড়ীতে সুনীতির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম একদিন। কথাবার্তা বলে নীচে নেমে আসতেই সুনীতির ছোট ভাই বল্ল তাদের বাড়ীতে আমার উপস্থিতিটা তাদের কাম্য নয়। সত্যি, বছরের পর বছর পুলিশের অমানুষিক অত্যাচার ও নানাভাবে নিপীড়িত হবার ফলে আমার উপর তাদের ক্রোধ স্বাভাবিক। এই পরিবারটি অপরিসীম নির্যাতন ভোগ করেছে। আমাদের দলের আর কারও পরিবার এতটা নিগৃহীত হয় নি।

—আট—

॥ ষ্টিভেন্স নিধন মামলা ॥

ষ্টিভেন্স হত্যার পরদিন The Statesman তাদের প্রধান সম্পাদকীয়তে লিখল—

"Obviously inquiry of the strictest kind must be pursued as to who armed these women, who incited them and who were their associates. Women do not do this kind of thing in India of their own accord and there must be behind this crime a conspiracy of a very deep-seated and dangerous kind." (15.12.31)

(স্পষ্টতঃ কঠোর অনুসন্ধান অবশ্যই চালানো উচিত কে তাদের অস্ত্র দিয়েছিল, কে তাদের উত্তেজিত করেছিল এবং কারা তাদের সাথী ছিল। ভারতবর্ষে মেয়েরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ কাজ করে না এবং এই অপরাধের পেছনে খুব গভীর ও বিপজ্জনক চক্রান্ত আছে।)

পুলিশ শ্বেতাঙ্গদের মুখপত্রের উপদেশ অনুযায়ী কাজ করতে আরম্ভ করল। যাকে তাকে গ্রেপ্তার, বাড়ী বাড়ী তল্লাসী ও অত্যাচার শুরু হয়ে গেল।

"……সরকারী চণ্ডনীতি এবার ক্ষিপ্তভাবে নির্যাতনের মুষল চালাইল। দলের প্রতিটি কর্মীর বাড়ী খানাতল্লাস হইল, পরিচিত প্রায় প্রতিটি পরিবারের উপর অমানুষিক নির্য্যাতন শুরু হইল। সুনীতির পরিবারের উপর, তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতার উপর অকথ্য অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল।—পুলিশ ব্রাহ্মণবাড়িয়া "চিত্তরঞ্জন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের" বড় বড় ঘরগুলি হাতী দিয়া ভাঙিল ও ললিতবাবুর দীর্ঘদিনের চেষ্টায় গঠিত ও কষ্টে সংগৃহীত মস্ত লাইব্রেরীর সমুদয় বই স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে আগুন দিয়া পুড়াইয়া দিল।"—('বিপ্লবী ললিত মোহন বর্মণ' পুস্তিকা হতে উদ্ধৃত।)

"সুনীতিদের বাড়ীটাকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট তাঁদের পরিবারকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চেয়েছিল। সুনীতির বাবার পেনসন বন্ধ করে দিল। সুনীতির দুই দাদাকে গ্রেপ্তার ও বন্দী করল। তাঁর পিতামাতা ছোট সন্তানদের নিয়ে উপবাসের মুখে পড়ে গেলেন। আত্মীয় স্বজনেরা সাহায্য করতে গেলে পুলিশ তাঁদের নির্যাতন করতে আরম্ভ করে। তাঁরা সাহায্য বন্ধ করলেন। সুনীতির ছোট ভাই আর্থিক সঙ্গতির চেষ্টা করতে গিয়ে অত্যন্ত ক্লিষ্ট জীবন যাপন করার ফলে যক্ষ্মাতে মৃত্যুবরণ করেন। এর উপরেও বাড়ীতে পুলিশের অত্যাচারের অবধি ছিল না। বাড়ীর এই নিদারুণ দুঃখের কথা সুনীতি জেলে সবই জানলেন। কিন্তু দুঃখের বজ্রাঘাতে মাথা নত করবেন সুনীতি সে-মেয়ে ছিলেন না। অন্য ধাতু দিয়ে গড়া এ মেয়ে।" (স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী। পৃঃ ১১৭)

সুনীতির পিতা উমাচরণ চৌধুরী, মাতা সুরসুন্দরী দেবী। উমাচরণ চৌধুরী ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী। সুনীতির বড় দু'ভাই সুকুমার চৌধুরী ও শিশির চৌধুরী কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।

শান্তির মা দুপুরে খেতে বসেছিলেন তখন পুলিশ ঘেরাও করল তাদের বাড়ী, খেতে আর হল না। সব কিছুই তল্লাসী হল। ছোট ভাই ও বোনকে গ্রেপ্তারের অযোগ্য মনে করল। তারা বড় বেশী ছোট। শান্তির ব্যবহৃত খাতা বই নিয়ে গেল। প্রায়ই নানা অজুহাতে নানাভাবে পুলিশ উৎপীড়ন করেছে শান্তির মাকে।

পুলিশ শান্তি ও সুনীতির কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য নানারকম চেষ্টা করেছিল। দুজন একসঙ্গে থাকলে জেলের নিঃসঙ্গতার যাতনা উপলব্ধি করতে পারে না তাই দুজনকে দু জেলে নিয়ে রাখল। অর্থের প্রলোভন, বিলেতে থেকে পড়বার, সকল রকম সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি সব অস্ত্রই প্রয়োগ করেছিল। পাশবিক অত্যাচার করে জর্জরিত করে তুলেছিল সুনীতির বাবা ভাইদের। ভেবেছিল মা বাবা ভাই এর দুঃখে সুনীতি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ

করবে। ব্যর্থ হল পুলিশের সকল চেষ্টা। উল্টোনীতি অনুসরণ করেছিল শান্তির জন্য। শান্তির মা বিধবা। ছোট একটি ছেলে ও মেয়ে। তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে দেবার প্রলোভন দেখিয়ে অনুনয় বিনয় করে শান্তির মাকে নিয়ে গেল ঢাকা জেলে শান্তির একটা স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য। শান্তির সঙ্গে দেখা হতেই পুলিশের দুরভিসন্ধির কথা বলে দিলেন তার মা! এ নরম পন্থাও ব্যর্থ হল!

বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য কলকাতায় একটি বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে গ্রেপ্তার হলেন। লর্ড সিংহ রোডে নিয়ে গিয়ে কয়েকদিন ক্রমান্বয়ে চালাল তার উপর নানা রকম প্রহার, নানা রকম বীভৎস অত্যাচার। শয্যাগত না হওয়া পর্য্যন্ত রেহাই পান নি।

সতীশ রায়ও ধৃত হল। কয়েকদিন চলেছিল তার উপর কম্বল ধোলাই। দুটো হাঁটু অনড় হয়ে যাবার পর থামল পুলিশের অত্যাচার।

নির্মম মারের ফলে পাগল হয়ে গেল বিনয় দত্ত।

আমার গ্রামের বাড়ীতে খানাতল্লাসী হত প্রায়ই অকারণে উৎপীড়ন করার জন্য। ভাই দুজন নানাভাবে অত্যাচারিত হয়েছিল।

পার্টির সদস্যদের গ্রেপ্তার, অত্যাচার, অর্থের লোভ, পরিবারের উপর অমানুষিক উৎপীড়ন সবই ব্যর্থ হল। ষড়যন্ত্র-মামলা করার জন্য পুলিশ পেল না কোন সাহায্য। কুমিল্লায় আমাদের সংগঠনটি এতই দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সদস্যদের পার্টির প্রতি আনুগত্য ও দেশপ্রেম ছিল গভীর। এখানে উল্লেখ করতে চাই যে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানদেরও সাহায্য পায়নি পুলিশ। যে গাড়োয়ান কোর্টবাড়ীতে আমাদের নিয়ে যেত ও আসত, সে আমাকে ভালভাবেই চিনত। কিন্তু জেলখানায় সেও আমাকে সনাক্ত করল না। সাধারণ মানুষও আমাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিল সে যুগে। পুলিশের ভয় প্রলোভন সবই ব্যর্থ হল। একটিও সাক্ষী মিলল না, একটিও স্বীকারোক্তি আদায় হল না,

একটিও সাহায্যকারী নথিপত্র পেল না। ব্যর্থ হল পুলিশের সকল প্রচেষ্টা, পারল না ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করতে।

তাই শুধু শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীকে বিচারের জন্য স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হল। প্রেসিডেণ্ট করা হয়েছিল হাইকোর্টের জজ মিঃ পিয়ারসনকে অন্য দুজন সদস্য জজ এস, সি, মল্লিক ও জজ এস, কে, ঘোষ। বিচার শুরু হয় ১৮ই জানুয়ারী ১৯৩২ সালে।

"মামলার সময় শান্তি সুনীতি তাঁদের হাসি উচ্ছ্বাস ও তেজস্বিতায় সমস্ত কোর্টকে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। মামলার দ্বিতীয় দিনে ডকে তাঁদের বসতে চেয়ার দেওয়া হয়নি বলে তাঁরা পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর থেকে শেষ দিন পর্যন্ত ডকে তাঁদের চেয়ার দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে ১৯৩২ সালের ২৭শে জানুয়ারী শান্তি-সুনীতি সমগ্র সত্তা কেন্দ্রীভূত করে যখন অপেক্ষা করছিলেন ফাঁসীর আদেশ শুনবার জন্য, তখন তাঁরা দণ্ডাদেশ শুনলেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের। অফুরন্ত উৎসাহভরা প্রাণ তাদের সেই মুহূর্তে নিরাশা বোধই করেছিল। কিন্তু তাঁরা যে ১৪/১৫ বছরের কিশোরী নাবালিকা। স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী, ফাঁসী কি করে হবে?"

(স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী। পৃঃ ১১৬)

রায় দেবার সময় প্রেসিডেণ্ট মিঃ পিয়ারসন মন্তব্য করলেন.......
"of any sign of remorse after lapse of time we have had no indication, on the contrary their demeneour in the dock has been one of cheerful disregard of consequences."

(সময় উত্তীর্ণ হলেও অনুশোচনার কোন চিহ্নের আমরা নিদর্শন পাইনি পক্ষান্তরে কাঠগড়ায় তাদের ব্যবহারে পরিণাম সম্পর্কে খুশিভরা অবজ্ঞার ভাব ছিল।)

The Statesman পত্রিকা ২৮/১/৩২ তারিখের রিপোর্টে লিখল—
"The prisoners received the sentence unmoved. When later they were being removed from the dock they

shouted—"It is better to die than remain confined in a stable."

(বন্দীরা অবিচলিত ভাবে রায় গ্রহণ করেছিল। পরে যখন তাদের কাঠগড়া হতে সরিয়ে নেওয়া হয় তখন তারা চীৎকার করে বলেছিল—"আস্তাবলে বন্দী থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল।")

The Statesman সেদিন তাদের সম্পাদকীয়তে লিখল :—

"All that need be said of the sentence on the two girls who murdered Mr Stevens at Comilla is that it was generally expected.……But there is much that the public would like to know, who for example filled girls of this age with the pernicious idea that murder was service to their country? Who draw up their plan of action? Whence come their firearms? Few will believe that thay committed the crime without instruction and help."

(ষ্টিভেন্স হত্যার জন্য বালিকা দুটিকে যে দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে বলা যায় এটাই মোটামুটি আশা ছিল।……কিন্তু জনসাধারণ আরও কিছু জানতে চাইবে। উদাহরণ স্বরূপ কে এই বয়সের বালিকাদের অনিষ্টকর ধারণায় মন ভরে দিয়েছিল যে খুন দেশের কাজ? কে তাদের কাজের পরিকল্পনা তৈরী করেছিল? কোথা হতে আগ্নেয়াস্ত্র এসেছিল? খুব কম লোকেই বিশ্বাস করবে যে তারা নির্দেশ ও সাহায্য ছাড়া এ অপরাধ করেছিল।)

শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের কৌতুহলের মীমাংসা করতে পারেনি সেদিনকার নিপুণ পুলিশ বাহিনী।

আমরা যারা ষ্টিভেন্স নিধন ও তার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলাম সকলকেই মুক্তি দিয়ে বেঙ্গল অর্ডিনান্সে আটক করে রাখা হল। যারা আটক হলেন তাদের মধ্যে ছিলেন বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

নরেশ (হাবুল) ব্যানার্জী, নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য, বঙ্কিম চক্রবর্তী, ননী রায়, চন্দ্রকিশোর সরকার, মনীন্দ্রলাল রায়চৌধুরী, প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম, অন্নদা দাস, সত্যব্রত সেন, বীরেন্দ্র দত্ত গুপ্ত, রবীন্দ্র গোস্বামী, শিশির চৌধুরী, সুকুমার চৌধুরী, সতীশ রায়, সমরেন্দ্র নন্দী, বিনয় নন্দী প্রভৃতি।

বেঙ্গল অর্ডিনান্সে বন্দী করেই আমাকে নিয়ে গেল কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে। মাস দুই পর খবর এল বাছাই করা একশত রাজবন্দীকে দেউলিতে পাঠাবার বন্দোবস্ত হয়েছে। বাংলাদেশ হতে সুদূর রাজপুতনার মরুভূমিতে বাংলার রাজবন্দীদের নির্বাসন দেবার জন্য বন্দীশালা প্রস্তুত হয়েছে। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হবে না, তাই এই স্থান নির্বাচিত হয়েছে। দেউলির আশি মাইলের মধ্যে কোন রেল ষ্টেশন নেই। জনমানবহীন অঞ্চল দেউলি ভয়াবহ জায়গা, নানা গুজবে ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হল সকলেই।

একদিন নিমন্ত্রণ এল ইলিসিয়াম রোতে যাবার। বাংলার বিপ্লবীদের নিকট এটি একটি রোমাঞ্চকর স্থান। তীর্থ দর্শনের সুযোগে খুশীই হলাম। যথাসময়ে সশস্ত্রী প্রহরী বেষ্টিত প্রিজনভ্যানে নিয়ে গেল সেখানে। একতলায় একটা ঘরে বসতে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এদিক ওদিক থেকে কয়েকজন এলেন। কেউ কেউ আমার চেহারাটা দেখে বোধ হয় পছন্দ না হওয়ায় ফিরে গেলেন। কেউ কেউ কুমিল্লা সম্পর্কে নানা কথা বল্লেন। এদের একজনের বাড়ী ছিল কুমিল্লা। বলা নিষ্প্রয়োজন সকলেই গোয়েন্দা বাহিনীর লোক।

তারপর আমাকে নিয়ে গেল ঐ বাড়ীর সম্রাট নলিনী মজুমদারের ঘরে। মজুমদার সাহেব খুব সমাদরে তার সামনের চেয়ারে আমাকে বসালেন। প্রায় পাঁচ মিনিট কোন কথা না বলে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। একটু পরেই এক বেয়ারা একগাদা ফাইল এনে তাঁর টেবিলে রাখল। তিনি ফাইলগুলো খোলেন আর মাঝে মাঝে

আমাকে অতীতের কাজকর্ম সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেন। বুঝলাম ১৯২৫ সাল থেকেই আমার কাজের রেকর্ড ফাইলে রয়েছে।

ফাইল দেখার পালা শেষ হলে আমাকে বল্লেন, "আপনাকে দেউলি পাঠাচ্ছি। যতদিন চোখের দৃষ্টি থাকবে, শরীরে শক্তি থাকবে ততদিন ওখানেই থাকতে হবে। আপনার হাতের রক্তের দাগ তখনও উঠবে না। যাই হউক এবার বলুন আপনার পরিবারের জন্য কি করতে পারি?"

"কিছুই করতে হবে না" বলে আমি উঠে পড়লাম। তিনিও আমাকে জেলে ফিরিয়ে নেবার হুকুম দিলেন।

যখন আমি বের হয়ে আসছি তখন কুমিল্লার লোকটি জানাল দেউলিতে রাজবন্দীদের নির্বাসনের বিরুদ্ধে সব কাগজে লেখালেখি হচ্ছে। লিবার্টি পত্রিকা একটি গরম সম্পাদকীয় লিখেছে। আরও বল্লেন ওখানে এত গরম যে বাঙ্গালীরা বাঁচতে পারবে না।

একদিন প্রত্যাশিত নোটিশ পেলাম দেউলি যাত্রার। আমরা প্রথম দলের যাত্রীরা নানা ভাবনা নিয়ে প্রস্তুত হলাম। নির্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যার পর প্রেসিডেন্সি জেলের গেটে সমবেত হলাম। বোধ হয় ত্রিশজন। আমাদের প্রহরী 'হাওড়া ব্রীজ'। প্রায় ৬॥ ফুট লম্বা এবং বেশ মোটা দেহের অধিকারী সার্জেণ্ট সাহেবটির নাম দিয়েছিলাম 'হাওড়াব্রীজ'। জেল গেট থেকে একটু দূরে প্রিজন ভ্যানে উঠবার রাস্তার দুপাশে রিভলভার হাতে শাদা সার্জেণ্টগুলো লাইন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন বরযাত্রীরঅভ্যর্থনার ব্যবস্থা! দৃশ্যটি চমৎকার!

আমাদের নিয়ে প্রিজনভ্যান ছুটে চল্ল হাওড়া ষ্টেশনে। কলকাতাকে রাতের অন্ধকারে একটু দেখে নিলাম। ষ্টেশনে আর কিছু দেখার সুযোগ হল না, প্রিজন ভ্যান থেকে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো গাড়ীতে ঢুকিয়ে দিল। একটি কামরা রিজার্ভ করা ছিল আমাদের জন্য, অবশ্য সঙ্গে প্রহরীর দলও ছিল।

১৯৩২ সালের জুনের প্রথম সপ্তাহে যাত্রা করলাম রাজবন্দী রূপে

রাজস্থানে। যাত্রা পথে যমুনার জলে চান এবং দূর থেকে তাজমহল দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব যতদিন থাকবে, ততদিন ঐ দেউলি বন্দীশিবির হতে আমাদের মুক্তি নেই, বাংলা দেশে ফিরে আসার আশা নেই, এইরকম একটা ধারণা সেদিন মনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল নানা জনের নানা ধরণের কথাবার্তায়।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক রক্তাক্ত অধ্যায়ের শেষভাগে জন্মভূমি হতে নির্বাসনে যাওয়ার পূর্বে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিলাম মাইকেলের এক বিখ্যাত কবিতার পংক্তি আউড়িয়ে—'প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে এদেহ আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে।'

যাহোক, দেউলি ক্যাম্পে রাজবন্দী আমাদের মৃত্যু হয়নি। তারপরেও অনেক ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলাম। মাইকেলের বদলে সত্যেন দত্তের 'বাঙালী' কবিতার ভাষায় এখন বলতে পারি…
"মারী নিয়ে ঘর করি, বাঁচিয়া গিয়াছি বিধির বিধানে অমৃতের টিকা পরি।"

॥ ত্রিপুরার শহীদনামা ॥

অশোক নন্দী।

জন্মস্থান—কালীকচ্ছ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

পিতার নাম—ডাঃ মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী। বিচারাধীন থাকাকালে মৃত্যুবরণ করেন ৬ই আগষ্ট ১৯০৯ সাল।

ললিতচন্দ্র চৌধুরী।

জন্মস্থান—বাগবাড়ী, চাঁদপুর মহকুমা।

পিতা—শশীভূষণ চৌধুরী।

মুন্সিগঞ্জ বোমার মামলায় ১৯১১ সনের ১০ই এপ্রিল দশ বছর দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। ১৯১৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলে প্রাণত্যাগ করেন।

তারিণী মজুমদার।

জন্মস্থান—কালীনগর, সদর মহকুমা।

১৯১৮ সালের ১৫ই জুন ঢাকা শহরের কলতা বাজারে গোপন আশ্রয়স্থলে পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে মৃত্যু ঘটে।

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য।

জন্মস্থান—লেসিয়ারা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা।

চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের অন্যতম সৈনিক। জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় গুলিতে নিহত হন ২২শে এপ্রিল ১৯৩০ সালে।

ত্রিপুরা সেনগুপ্ত।

জন্মস্থান—কুমিল্লা শহর।

পিতার নাম—নিবারণচন্দ্র সেনগুপ্ত।

চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের অন্যতম সৈনিক। জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরেজ সৈনিকের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন ২২শে এপ্রিল ১৯৩০ সালে।

অসিতরঞ্জন ভট্টাচার্য।

জন্মস্থান—লেসিয়ারা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা।

পিতা—ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য।

ইটাখোলা পোষ্টাফিসের মেলব্যাগ ছিনিয়ে নেবার অভিযোগে বিচার হয় এবং মৃত্যু দণ্ডের আদেশ হয়। ১৯৩৪ সালের ২রা জুলাই শ্রীহট্ট জেলে তাঁর ফাঁসি হয়। অসিতরঞ্জনই ত্রিপুরার প্রথম শহীদ যে—"ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল জীবনের জয়গান।"

শৈলেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

জন্মস্থান—কুমিল্লা শহর।

পিতা—বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

রাজপুতনায় দেউলি বন্দী নিবাসে ম্যালিগনাণ্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। ডাক্তারের ভুল চিকিৎসার ফলে মৃত্যু ঘটে ১৭ই অক্টোবর ১৯৩৩ সালে।

যশোদারঞ্জন পাল।

জন্মস্থান—ইব্রাহিমপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা।

বিস্ফোরক রাখা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ১৯২৪ সালের মে মাসে দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়, হাইকোর্টে দশ বছর দণ্ড

সাত বৎসরে হ্রাস করা হয়। টি, বিতে আক্রান্ত হয়ে জেলে প্রচুর রক্তবমন করতে থাকায় জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তির অব্যবহিত পরে ১৯২৬ সালে তাঁর মৃত্যু ঘটে কুমিল্লায়।

সুধেন্দ্রকুমার দত্ত।

জন্মস্থান—হানারচর, চাঁদপুর মহকুমা।

পিতা—কালীকিশোর দত্ত।

সুধেন্দ্রকে পুলিশ বন্দী করে ১৯৩৪ সালের ৮ই আগষ্ট। প্রেসিডেন্স জেল থেকে মুক্তি পান। স্বগৃহে অন্তরীণ থাকাকালে রোগে মৃত্যু ঘটে ১৯৩৬ সালের ১৭ই মার্চ।

প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম।

জন্মস্থান—কুমিল্লা শহর। পৈত্রিক নিবাস—কাকসার।

পিতা—রজনী ব্রহ্ম।

কুমিল্লা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার পর ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৩১ সালে প্রফুল্লনলিনীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩৬ সালে তাঁকে কাকসার গ্রামে স্বগৃহে এবং পরে কুমিল্লা শহরে অন্তরীন রাখে। অন্তরীন অবস্থায় তাঁর এপেণ্ডিসাইটিস হয়, চিকিৎসার জন্য কলিকাতা নিয়ে যাবার জন্য স্থানীয় চিকিৎসক পরামর্শ দেন। কিন্তু সরকারের অনুমতি পাওয়া গেল না। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে ১৯৩৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী অস্ফুট মুকুলটি অকালে ঝরে পড়ে গেল।

সত্যেন্দ্র নাথ রায়।

জন্মস্থান—গোকর্ণ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা।

মালয়ে আজাদহিন্দ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। বর্মায় কালেবার নিকটে মৃত্যুবরণ করেন।

সত্যেন্দ্রচন্দ্র বর্দ্ধন।

জন্মস্থান, বিটঘর—ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা।

পিতা—দীনেশচন্দ্র বর্দ্ধন।

আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগ দিয়ে সাবমেরিনযোগে ভারতের উপকূলে উপস্থিন হন। বৃটিশ সৈন্যের দ্বারা ধৃত হয়ে মাদ্রাজ জেলে বন্দী থাকেন। গুপ্তচর বৃত্তির অপরাধে ১৯৪৩ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ জেলে তাঁর ফাঁসি হয়।

গোপালচন্দ্র সেন।

জন্মস্থান—ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

১৯৩৭ সালে বি, ভি, দলে যোগ দেন। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় বর্মাদেশে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সঙ্গে গোপন যোগাযোগ স্থাপন করেন। পুলিশ তাঁর গোপন আস্তানায় (৪৬, শিবঠাকুর লেন, বড়বাজার) হানা দেয় ১৯৪৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর। গোপন কাগজ-পত্র পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁকে ধাক্কা দিয়ে চারতলা থেকে নীচে ফেলে দেয়। হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

বিনয়ভূষণ দত্ত।

জন্মস্থান—সুলতানপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা।

পিতার নাম—বিপিনবিহারী দত্ত।

কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্স হত্যার অভিযোগে ১৯৩২ সালে গ্রেপ্তার হন। কুমিল্লার জেলগেটে একদিন বুটজুতো পরিহিত পুলিশ মাথায় পদাঘাত করে। কিছুদিন পর মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দেয়। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর চিকিৎসায় কোন ফল হয় নি। ১৯৪৪ সালের ১লা এপ্রিল হতে নিরুদ্দেশ।